Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহারিয়া আফরিন পূর্ণা

রোলঃ 227020097

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহারিয়া আফরিন পূর্ণা

রোলঃ 227020097

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহারিয়া আফরিন পূর্ণা, আইডিঃ 227020097 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

শাহারিয়া আফরিন পূর্ণা

আইডিঃ 227020097

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা সৃষ্টিজগতের রবের, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক,যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি সৃষ্টিজগতের সকল প্রাণীকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি বিশ্বজগতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন রহমত স্বরুপ।

কুরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি নাযিল হয়েছে জীবনবিধান হিসেবে। কুরআন বাতলে দেয় অনন্তের পথ। আর এই কুরআনের ভাষাই হলো আরবি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন'

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আমি একে আরবি কুরআন রূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসুপ; আয়াত নং:০২)

আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'য়ালা আরবি ভাষাকেই বেছে নিয়েছেন কুরআনের ভাষা হিসেবে। আল্লাহর হাবিব প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা আরবি। এরই ধারাবাহিকতাই হাদিস, ইসলামের যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এই ভাষায়।

এই ভাষার সহজতা, সাবলীলতা এই ভাষাকে করে তুলেছে অনন্য।সবার জন্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা এই ভাষাকে সহজ করে দিয়েছেন।প্রতিটি মানুষ যেনো আল্লাহর দেওয়া বাতলে দেওয়া পথ বুঝতে পারে।

কোনো কিতাবকে বুঝতে হলে সে কিতাবের ভাষা বুঝার প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন আল্লাহর ভাষা। এই ভাষাকে সম্পূর্ণ রূপে অনুবাদ করা অন্য কোনো ভাষা দিয়ে সম্ভব নয়।তাই তো কুরআন বুঝার জন্য, কুরআনের মণি-মুক্তো আহরণের জন্য এই ভাষা শিখার জুরি নেই।

আরবি ভাষা শিখার ফলে আমরা কুরআনের নূর আহরণ করতে পারবো। কুরআন কে ভালো ভাবে বুঝতে পারবো। কুরআনের সাথে সম্পর্ক হবে আরো গভীর। প্রতিটি শব্দ বুঝার ফলে

আল্লাহ সুবহানাআল্লাহু তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক হবে আরো গভীরত।আল্লাহর বিধি নিষেধ গুলো দৈনন্দিন জীবনের তা প্রয়োগ করতে আরো সহজবোধ্য হয়ে যাবে।কুরআন মুখস্থকরণ ও সহজ হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। এই ভাষা শিখা ব্যতীত কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব নয়।

কুরআনকে নিজেদের জীবনের পাথেয় হিসেবে গড়ে তুলতে অবশ্যই আরবি ভাষা শিখতে হবে।নতুবা কুরাআনের আলোয় নিজেদের জীবন আলোকিত করতে পারবো না কারণ কোনো ভাষার গভীরতা বুঝতে হলে ওই ভাষা সবার প্রথমে আত্তস্থ করতে হয়। আর কুরআন এমন একটি কিতাব যা নাযিল করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'য়ালা।
আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩

নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী। (আল হিজর; আয়াত নং:০৯)

কুরআন এমন এক গ্রন্থ যার মতো অনুরূপ গ্রন্থ বা একে বিকৃত কেউ করতে পারবে না।কেননা এর হিফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'য়ালা।

আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে রাসূল (সঃ) এর শিক্ষা, সুন্নাহ, হাদিস সমূহ। যদিও অন্য ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি ভাবার্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর ভাষা, আল কুরআনের ভাষা, রাসূলের (সঃ) শিক্ষা, রাসূলের (সঃ)মুখনিঃসৃত বাণী গুলো বুঝতে হলে আরবি ভাষা শিখার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

ভাষা

الرَّحْمَٰنُ ٥عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٥ خَلَقَ الْإِنسَانَ ٥ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٥

পরম করুণাময় ০ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন ০ তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ ০ তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা। (আর রহমান, আয়াত ১-৪)

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষ বিশেষ কোনো শিক্ষা ছাড়াই নিজে নিজেই বলতে পারে এবং তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে। এমন কি যে শিশুর কোন জ্ঞান ও বোধ শক্তি থাকে না সেও বলতে পারে। এটা আল্লাহর শিক্ষার ফল।

পারিভাষিক সংঙ্গায় বলতে গেলে মানুষের যোগাযোগের সহজাত মাধ্যমই বা বাহন হলো ভাষা। যোগাযোগের জন্য সর্বত্র এক ধরণের ভাষা আছে। ভাষা ছাড়া পৃথিবী চলতে পারে না। মানুষের দৈনন্দিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য ভাষা প্রয়োজন।

ভাষা আল্লাহর অনন্য এক নিয়ামত। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সেটা লিখিত হোক বা অলিখিত হোক। প্রাচীনকালে ভাষার রুপ অলিখিত হলেও ধীরে ধীরে তা লিখিত রুপে বিস্তার ঘটায়। এই ভাষা মানুষের চিন্তার বাহন। মানুষ চিন্তার খোরাক গুলো প্রকাশ করতে পারে তার ভাষার মাধ্যমে।

ভাষার রূপ বৈচিত্র্য

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ
আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদোর জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।
(সূরা রুম :২২)

দেশ ভেদে ভাষার পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। একটি দেশের মধ্যেও একাধিক ভাষা থাকতে পারে। পাপুয়া নিউগিনি,যেখানে ৮৫০ এর ও অধিক ভাষা রয়েছে।

চীনারা চা-কে চা উচ্চারণ করে। এই চা-ই উর্দু ও হিন্দিতে ‘চায়ে’ এবং ফারসিতে ‘চাই’ উচ্চারিত হয়। চা যখন আরব ভূখণ্ডে পৌঁছল, তখন আরবরা এর ‘চ’-কে ‘শ’-তে পরিবর্তন করে ‘শাই’ বলতে লাগল।

আরবিতে কাপের জন্য ‘কুব’ শব্দের ব্যবহারও খুব প্রচলিত। কুবের প্রতি ভালো করে ধ্যান দিলে ইংরেজি শব্দ ‘কাপ’-কে অত্যন্ত স্বচ্ছ দেখায়। ইংরেজিতে যেমন বলে, ওয়ার্ল্ড কাপ। আরবিতে এটিকেই ‘কা’ছুল আলাম’ বা বিশ্বকাপ বলা হয়।

ভাষার এই বৈচিত্র্যতা আল্লাহর এক অনন্য নিদর্শন। আল্লাহর অপার দয়ায় আমরা ভাষার এতোসব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে থাকি।

আরবি ভাষা

বিশ্বের ১১টি সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মধ্যে আরবি ভাষা অন্যতম। আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।এ ভাষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষা।কুরআনের ভাষা আরবি, যা এ ভাষাকে আরো অনন্য করে তুলেছে।

ব্যবহারের দিক থেকে এ ভাষার স্থান পঞ্চম। যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে।

আরবি ভাষা ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি জড়িত।সারাবিশ্বের মুসলিমরা এই ভাষায় তাদের প্রার্থণা করে। কুরআন তিলাওয়াত করে প্রতিদিন, যার ভাষা আরবি। মুসলিমরা এ ভাষাকে পবিত্র একটি ভাষা হিসেবে গণ্য করে। প্রিয় নবী (সঃ) এর ভাষা ছিলো আরবি, জিব্রাইল (আঃ)এর মাধ্যমে ওহী নাযিল হয় আরবিতে। মুসলিমদের বিশ্বাস মতে জান্নাতে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবে এই ভাষায়।

আরবি ভাষার বৈচিত্র্য

আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে বলা হয় ‘আল আরাবিয়া ‘। বিশ্বের ২৬ টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ৬ টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবি।

এই আরবি ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্যতা। প্রধান প্রধান বৈচিত্র্য গুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেকে একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ মনে করেন। কারণ এটি আল্লাহর কালাম, যা রচিত হয়েছে আরবি ভাষায়। স্বয়ং আল্লাহ-ই তা নাযিল করেন।

মডার্ণ স্ট্যান্ডার্ড আরবি,যা আজ অফিসিঅল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রুপ। এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রুপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি।
এটা ঠিক কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়।

আরবি-ই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে হযরত নুহ নবি পর্যন্ত সকল মানুষ একই ভাষায় কথা বলত। পরবর্তীতে মানববংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন ভাষার পয়দা হয়। বাইবেলে উল্লেখ আছে,

"প্লাবনের পরে সমস্ত পৃথিবী এক ভাষাতে কথা বলত। সমস্ত মানুষ একই শব্দগুলি ব্যবহার করত।"(বাইবেল, আদিপুস্তক ১১/১)

"এই সেই স্থান যেখানে প্রভু সমস্ত পৃথিবীর এক ভাষাকে অনেক ভাষাতে বিভক্ত করলেন। তাই এই স্থানটির নাম হলো বাবিল (বর্তমান ইরাক)। এইভাবে প্রভু তাঁদের সেই স্থান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন।"(বাইবেল, আদিপুস্তক-১১/৯)

খ্রিস্টানদের স্বরচিত ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ভাষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্যের একটি দিক উন্মোচন করেছে। অথচ পুরো সত্য প্রকাশ করেনি। শ্লোক থেকে বুঝা যায় সেই প্রাচীনতম, সেই প্রথম ভাষার নাম বাইবেল রচয়িতরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেছেন।

আল্লামা জালালউদ্দিন আস সুয়ুতি বলেন, সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম আ.-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দজ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা ছিল আরবি, এতে কোনো দ্বিমত নেই।

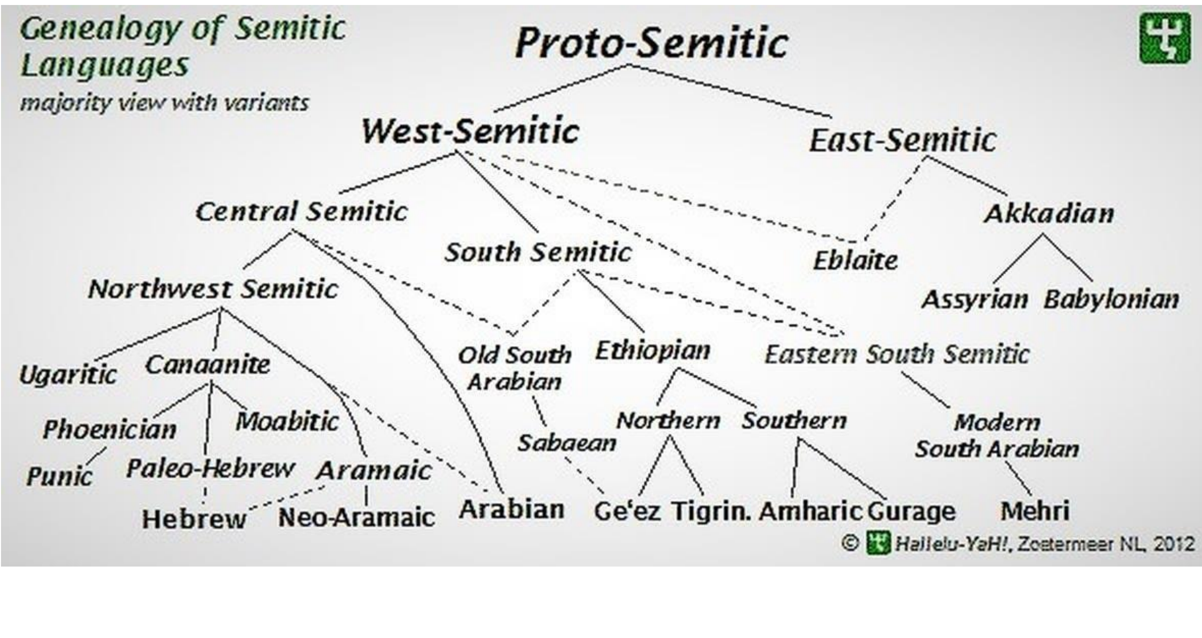
আবদুল মালিক ইবনে হাবিব এর বরাতে উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম আদম আ. যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন সেটি ছিল আরবি। (আল বুলগা ফি উসুলিল লুগাহ, নওয়াব সিদ্দিক খান)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল আযহারি র. (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি) বলেন, মানুষ দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা আদম আ.-কে আরবি ভাষা শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন।' আরবি ভাষা সবভাষার চেয়ে প্রাচীন ভাষা, এর বড় প্রমাণ হলো আল কুরআনের ভাষা আরবি।

আরবি ভাষার উৎস

আরবি একটি সেমিটিক ভাষা, যা মূলত আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের একটি অংশ। এটি এই পরিবারের প্রোটো-সেমিটিক শাখা থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো- এটি সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য উপগোষ্ঠীর (যেমন- উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক, সেন্ট্রাল সেমিটিক, দক্ষিণ সেমিটিক, পূর্ব সেমিটিক, পশ্চিম সেমিটিক) ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে হিব্রু, আরামাইক, সিরিয়াক, ফিনিশিয়, মিশরীয়, ক্যানানাইট, প্রাচীন উত্তর ও দক্ষিণ অ্যারাবিয়ান এবং ইথিওপীয়সহ অন্যান্য অসংখ্য মৃত ও সকল জীবিত আধুনিক ভাষা। যদি কেউ এই ভাষাগুলোতে কথা বলতে পারে, তা হলে বুঝতে পারবে এদের মধ্যে কত মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ, শুধু আরবি এবং হিব্রুতে সালাম এবং শালোমের মতো একটি শব্দের দিকে তাকানো যায়, যার উভয়েরই অর্থ 'শান্তি'।

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।



আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠক, চলুন দেখে আসি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

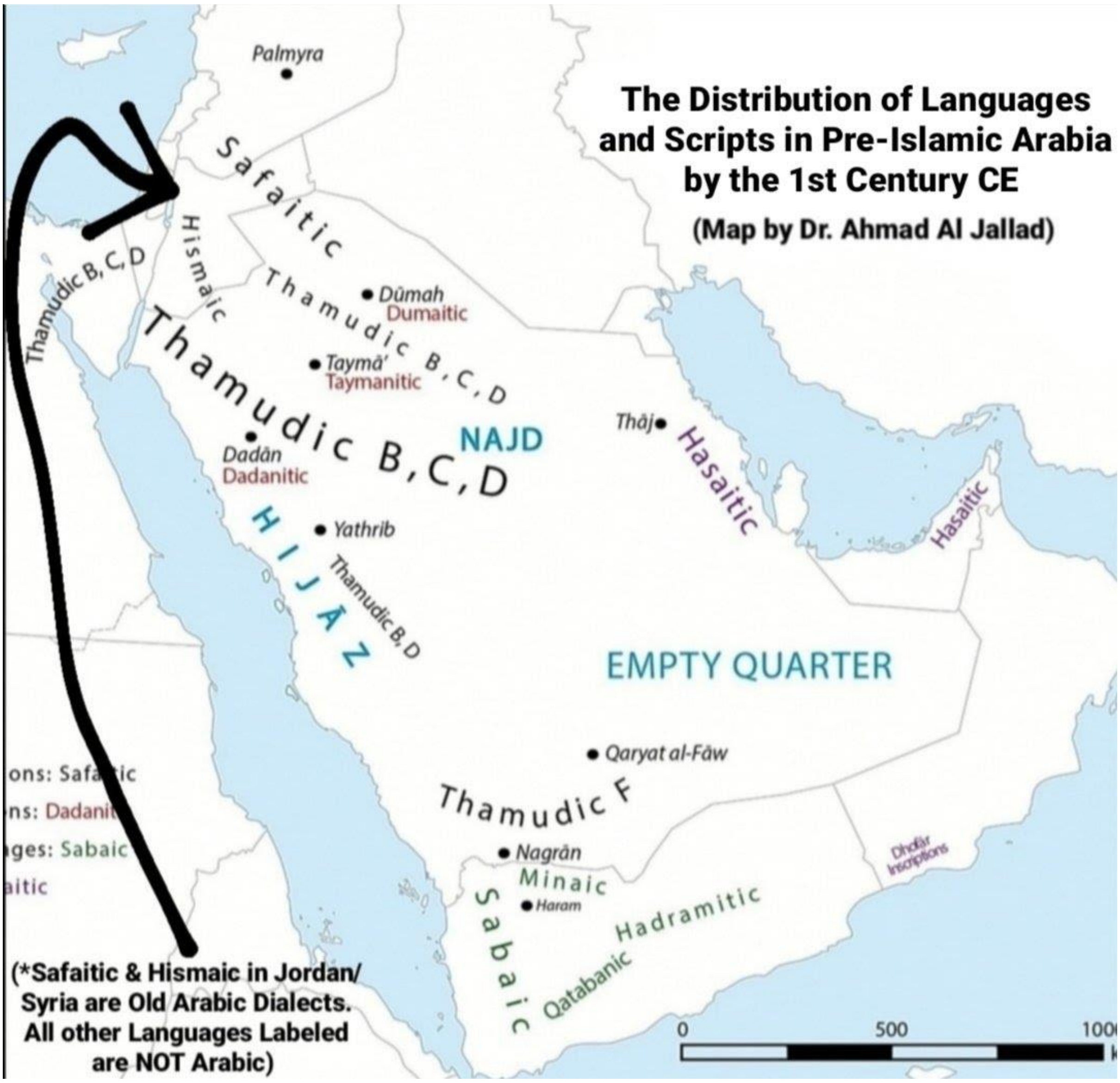
আফ্রো-এশীয় > সেমিটিক > পশ্চিম সেমিটিক > সেন্ট্রাল সেমিটিক > উত্তর আরবীয় ভাষা > আরবি ভাষা

সাফাইটিক এবং হিসমাইক আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল। বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত।

উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে 'থামুডিক সি' নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।


The Distribution of Languages and Scripts in Pre-Islamic Arabia by the 1st Century CE
(Map by Dr. Ahmad Al Jallad)
Palmyra
Safaitic
Hismaic
Thamudic B, C, D
Dûmah
Dumaitic
Taymâ'
Taymanitic
Thamudic B, C, D
Dadân
Dadanitic
NAJD
Thâj
Hasaitic
Hasaitic
HIJĀZ
Yathrib
Thamudic B, D
EMPTY QUARTER
Qaryat al-Fâw
Thamudic F
Nagrân
Minaic
Haram
Sabaic
Hadramitic
Qatabanic
Dhofâr Inscriptions
ons: Safa tic
ns: Dadani
ges: Sabaic
aitic
(*Safaitic & Hismaic in Jordan/ Syria are Old Arabic Dialects. All other Languages Labeled are NOT Arabic)
0
500

পুরাতন আরবি

আরবি সম্পর্কিত অসংখ্য সেমিটিক ভাষা ত্রয়োদশ এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে আরবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এগুলোর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাদের আরবি ভাষা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। 'আরব' হিসেবে উল্লেখ করা লোকদের প্রাচীনতম প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর একটি অ্যাসিরিয়ান শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এতে শুধু আরবদের কথা বলা হয়েছে। এটি তাদের ভাষার কোনো প্রমাণ দেয় না। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীর মাঝে এমন কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যা আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপের প্রমাণ দেয়। এই শিলালিপিগুলোর মধ্যে কিছু আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং অন্যগুলো আরামাইক ভাষায় লেখা, তবে এতে আরবির কিছু প্রভাব দেখা যায়। এই শিলালিপিগুলোতে বেশিরভাগই সাধারণ নাম, তাই এটাও আমাদের আরবি ভাষা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দেয় না।

আরবি ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মনে করা হয় জর্ডানের বায়ির এলাকায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকের একটি শিলালিপিকে। অবশ্য এর ভাষা আরবি না অন্য কোনো সেমিটিক ভাষা তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের দিককার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে সিরিয়া, জর্ডান ও উত্তর পশ্চিম সৌদি আরবে। মূলত এই লিপিগুলোর উপর ভিত্তি করে এগুলোকে একটি উত্তরের শাখা (সাফাইটিক) ও একটি দক্ষিণের শাখায় (হিসমাইক) ভাগ করা হয়। এগুলোতে ব্যবহৃত লিপি পরবর্তীকালের আরবি লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তৎকালীন দক্ষিণ আরবে প্রচলিত লিপি থেকে উৎপন্ন। কিন্তু লিপি আলাদা হলেও এই লেখাগুলোর ভাষা বিবেচনা করে এগুলোকে আরবি ভাষারই প্রাচীন রূপ বলে নির্ণয় করেছেন ভাষাবিদরা।

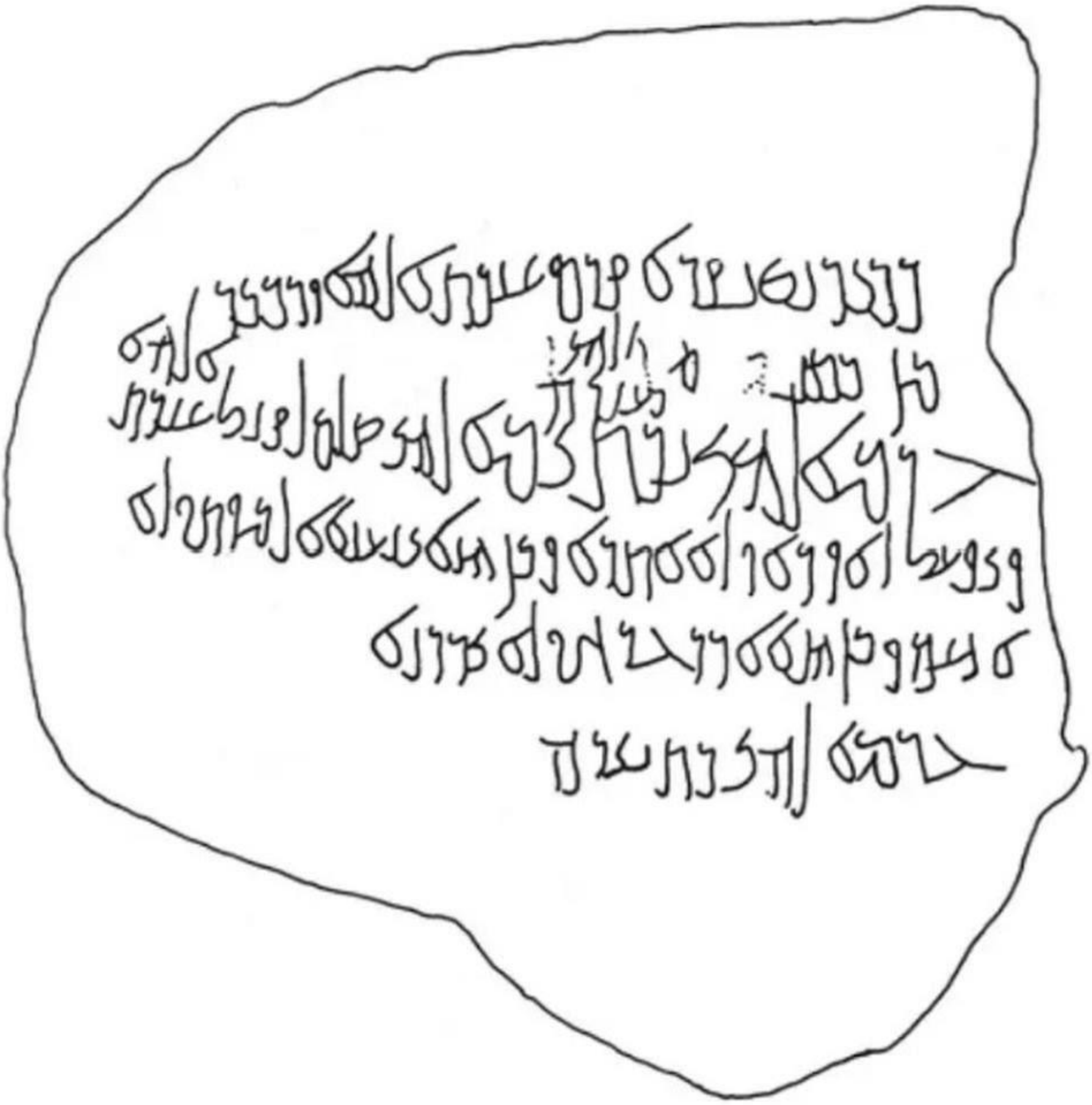
আরব উপদ্বীপের অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য লিপিতেও সেমিটিক ভাষায় আরও লেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই পরবর্তী কালের আরবি ভাষার পূর্বসূরী ছিল না বলে মনে করেন পণ্ডিতরা। সেই হিসেবে দেখলে উত্তর-পশ্চিম আরব ও দক্ষিণ শাম (লেভান্ট বা Levant)-এ আরবি ভাষার প্রথম সহস্রাব্দের পূর্বপুরুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আইন আভদাতে পাওয়া আরবি ভাষার প্রাচীনতম শিলালিপি

আরব ভূমিতে প্রধান রাজ্যগুলোর একটি ছিল নাবাতিয়ান রাজ্য। তাদের রাজধানী ছিল জর্ডানের পেট্রা নগরীতে, যা উত্তর আরবে অবস্থিত। তবে মজার ব্যাপার হলো, নাবাতিয়ান মানুষরা তখন আরবি ভাষা লিখত না। তাদের বাণিজ্যব্যবস্থা ছিল অন্যান্য দূরের রাজ্যগুলোতে। তাই যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হতো সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষা আরামাইক। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবি ভাষায় কথা বলতেন।

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবি ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত (Ein Avdat) শিলালিপিতে দেখা যায়। এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নিম্নোক্ত ছবিটি আইন আভদাত শিলালিপি, যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ 'আইন আভদাত'-এ পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবি ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।



তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে

পুরাতন আরবির একটি নিদর্শন 'আন-নামারা' শিলালিপি

প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়।

প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবি ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবির মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই আরবি ভাষায় লেখা, এগুলো আরবি লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে। কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবি ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা।

সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবি লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।





নাবাতিয়ান থেকে যেভাবে এলো আরবি লিপি

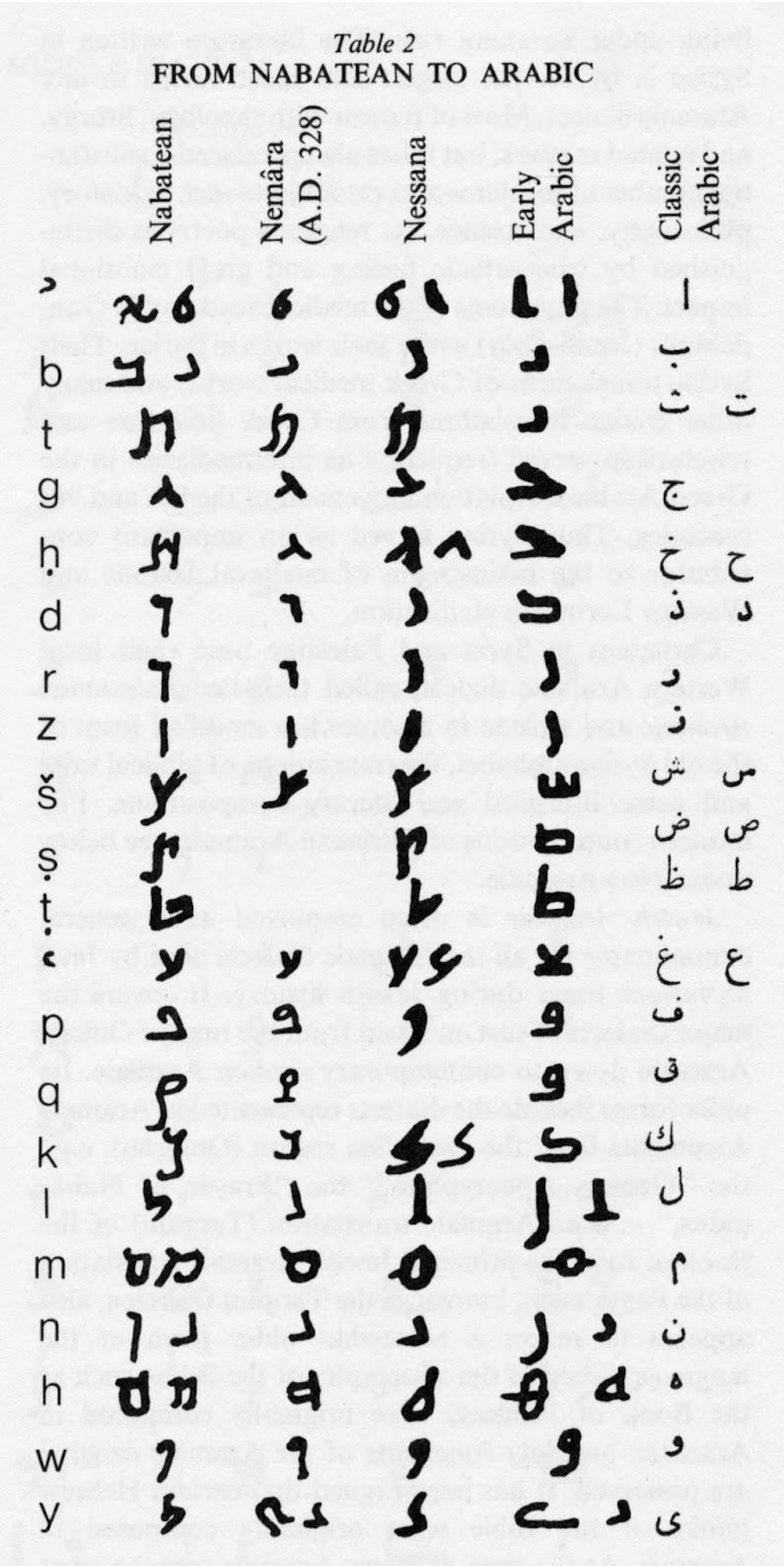
দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক।

এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবি বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো। এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়।

আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা।

উত্তর আরবে 'উকাজ'-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।



(নাবাতিয়ান থেকে আরবি বর্ণমালার রূপান্তর)

আরবি বর্ণমালার বংশধারা

সাতশ থেকেও অধিকসংখ্যক বর্ণ বা চিহ্ন-সংবলিত লিখিত রীতি থেকে মাত্র ২২ টি বর্ণ বা চিহ্ন গ্রহণ করেছিলো কেনানীয়রা। কেনানীয়দের থেকে উইঘুর এবং ফোনেশিয়ান বর্ণমালার উদ্ভব।ফোনেশিয়ার একটি পরম্পরা ধরে রূপান্তরিত হয়েছে প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালা। এরপর গ্রিক এবং গ্রিক থেকে সিরিলিক ভাষার লিখিত রূপ উৎপন্ন হয়। বর্তমানে সিরিলিক বর্ণমালার ব্যবহার পাওয়া যায় রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ইউক্রেনসহ আরও বেশ কিছু অঞ্চলে।ফোনেশিয়ার আরেকটি পরম্পরা ধরে রূপান্তরিত হয়েছে ল্যাটিন বর্ণমালা আর সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিম ভাষাগুলোর বর্ণমালা তথা ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ,জার্মান। ফোনেশিয়া ভাষার অপর পরম্পরা ধরে বিকশিত হয়েছে এরামিক বর্ণমালাগুলো। এরামিক থেকে উৎপন্ন হওয়া চারটি ভাষা থেকে সিরিয়াক,হিব্রু,পালমেরিন এবং ন্যাবাটিয়ান। আর এই ন্যাবাটিয়ান থেকে আরবি বর্ণমালার উৎপত্তি।

আরবি ভাষার ক্রমবিকাশ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই। আরবি-ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভূত। জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি-ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি !

জাহেলী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে 'আল-আসরুল জাহেলিয়াহ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি-ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি-ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা'ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আশা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ ।

ইসলামী যুগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান 'আল-কুরআন' নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে।

আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট ১১ জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন 'আম্বার'-এর অধিবাসী 'মুররা বিন্ মুররা' এবং 'আসলাম বিন্ হাফরাহ্''। কারো মতে 'হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আবদে শাম্স্ । তিনি 'হিরারত অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা 'আম্বার'-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন-

"আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই"।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো ।

জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াত পাঠ করছিলেন।উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগ

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে 'খলিল বিন্ আহ্মদ' অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা 'আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান'-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর আল আদওয়ানি।

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ'-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

আব্বাসী যুগ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।



আধুনিক যুগ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত,যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক 'নাজিব মাহফুজ' আরবি ভাষায় তার 'ত্রয়ী' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল। আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান।

আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি। আরবি ভাষা ১ কোটি ২০ লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে । পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি

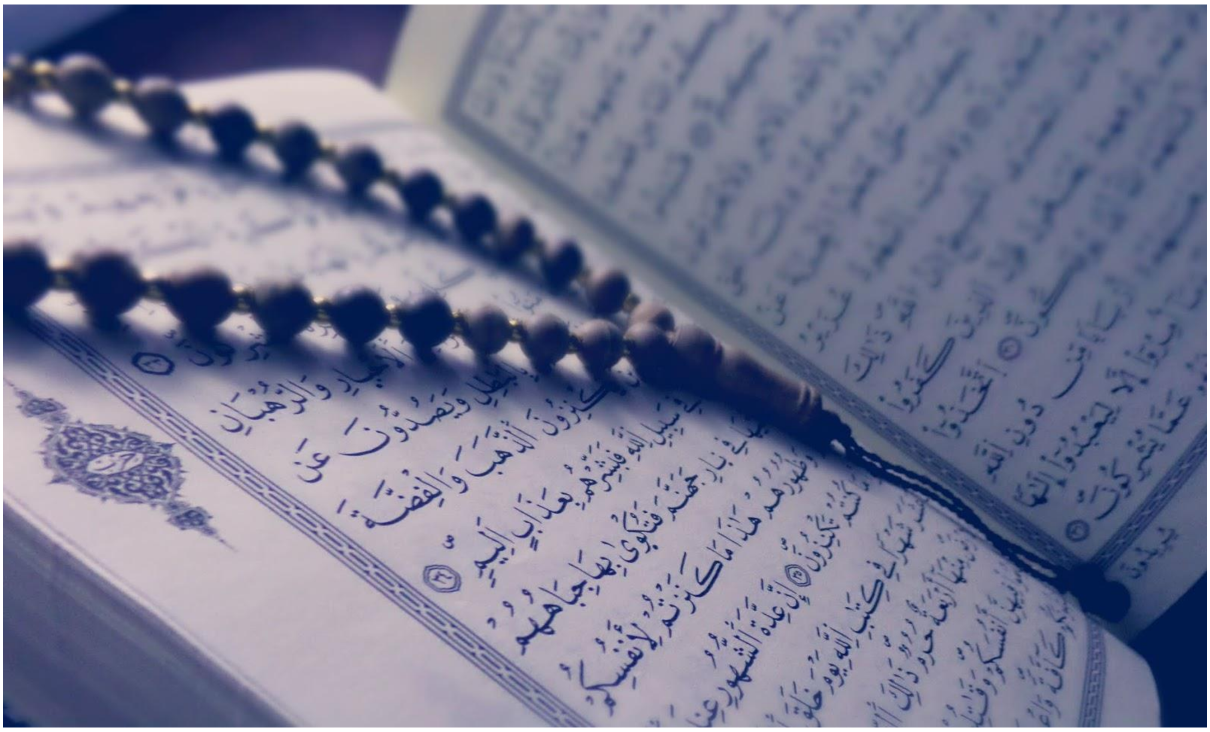
আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে 'কোইন' নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ।

ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো 'মুআল্লকাত' নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে 'আরাবিয়্যা' নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবির উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবি, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে।

কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবি ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়। পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবি প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় আরবি ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবি ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়।



সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাছাকাছি অর্থের শব্দ তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আরবি ‘সালিম’ মূলটি দেখা যাক। এর অর্থ ‘নিরাপদ’। মূল শব্দের সাথে স্বরবর্ণ বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে আমরা পাই: সালামুন (যার অর্থ শান্তি), মুসলিমুন (যার অর্থ মুসলিম)। আবার ‘কিতাব’ দেখি, যার অর্থ

'বই'। এ থেকে পেলাম কুতুবি (যার অর্থ বই বিক্রেতা), মক্তব (যার অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়)। আর এভাবেই আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়েছে।

নিউ আরবি এবং মধ্যে আরবি

যখন লিখিত ভাষা হিসেবে ধ্রুপদী আরবি প্রমিত হচ্ছে, আরব সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে আরবি ভাষার স্থানীয় উপভাষাগুলোও আবির্ভূত হয়। এই উপভাষাগুলো সরাসরি ধ্রুপদী আরবি থেকে আসেনি, বরং প্রাক-ইসলামিক আরবি উপভাষা 'কোইন' থেকে এসেছে। লেভান্ট এবং মেসোপটেমিয়ার উপভাষাগুলো আরামাইক দ্বারা, মাগরেবের উপভাষাগুলো বারবার (Berber) দ্বারা, মিশরের উপভাষাগুলো কপ্টিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবি প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবি এবং নব্য-আরবি বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবি ভাষা বলা হয়। 'মিডল' কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবি ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবির কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবি উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবিসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে, কিন্তু সাহিত্যিক আরবি তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, কারণ কুরআনের আরবিকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো। আদর্শ আরবি অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল, এবং এই কারণে নেপোলিয়ন মিশরে প্রবেশের পরেও তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে আরবি ভাষা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সংস্কৃতির প্রধান বাহন। এটি বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনে বহুল ব্যবহৃত হতো। ফলে ইউরোপের দেশগুলোর অনেক ভাষাও আরবি থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে। ইউরোপের খ্রিস্টান ও আরবের মুসলিম সভ্যতার নৈকট্য এবং দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবি শব্দ দেখা যায়।

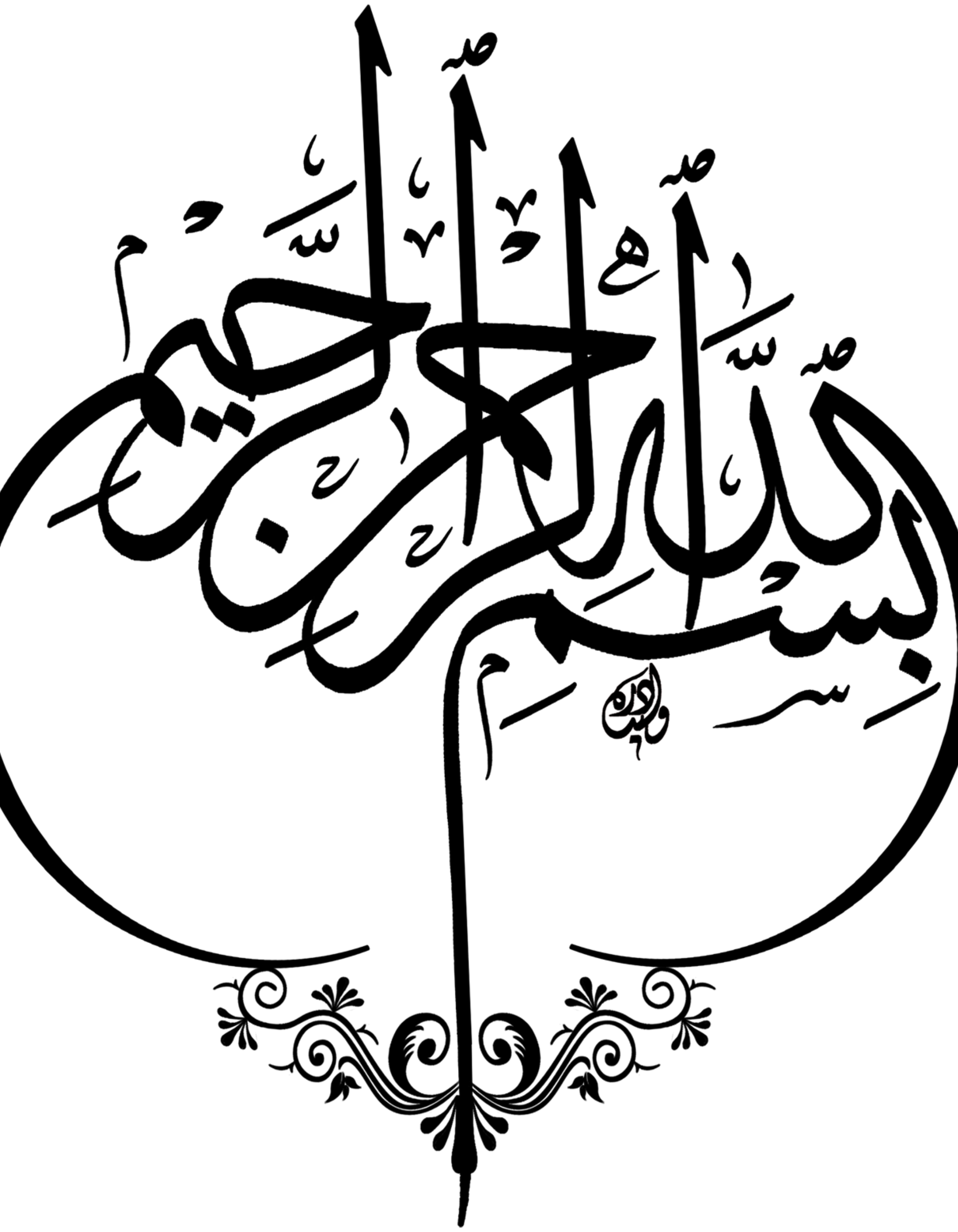
উদাহরণস্বরূপ, 'আলজেবরা' বা 'বীজগণিত' আরবি শব্দ 'আল-জাবর' থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবি ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে

এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ , গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের

উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- আবিসিনিয়ান।



আরবি বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবি ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ, মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবিতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত

আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে। ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

আরবি ভাষা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে

১৪ শতাব্দির পরে ইসলামী সাম্রাজ্যে মারাত্মক ফাটল ধরে এবং তা ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। সেটি ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং বড় বড় অংশগুলো বিদেশী শাসকদের হাতে চলে যায়। ইবনে খালদুন বলেনঃ "যখন দাইলাম এবং তাদের পরে সালজুক, যানিতাহ ও পশ্চিমে বারবারদের মত অনারবরা মুসলিম বিশ্বের শাসক বনে যায় এবং সিংহাসনে আসীন হয়, তখন আরবি ভাষার মধ্যে প্রচুর ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটে। এটি (আরবি) সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেত, যদি মুসলিমদের কুরআন এবং সুন্নাহ হেফাযত করার চেতনা না থাকত। ফলশ্রুতিতে এটিই আরবি ভাষাকে সংরক্ষণ করে।" (উৎস: ইবনে খালদুনের আল মুকাদ্দামাহ এর ৪৭৭ নং পৃষ্ঠা, ফ্রানয রোজেনথালের অনুবাদ থেকে নেওয়া)



হুনায়ুন ইবনে ইসহাকের মতানুসারে ১২০০ সনে অঙ্কিত মানুষের চোখের ছবি। (সূত্র: Wikimedia Commons)

এরপরে মোঙ্গলরা (মুসলিম বিশ্বে) হামলা করে বসে। ইবনে খালদুন বলেন, "কিন্তু যখন অমুসলিম তাতার এবং মোঙ্গলরা পূর্বদিকের শাসক বনে যায়, তখন এই আরবি ভাষার অনুকূলে থাকা বিষয়টি (অর্থাৎ, মুসলিমদের কুরআন এবং সুন্নাহকে হেফাযত করার প্রচেষ্টা) খতম হয়ে যায়। আরবি ভাষা তখন পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। মুসলিম রাজ্যগুলো যেমনঃ ইরাক, খুরাসান এবং ফারিস (দক্ষিণ ইরান), পূর্ব এবং পশ্চিম ভারত, ট্রানসোযিয়ানা, উত্তরের দেশগুলো এবং বাইযেনটাইন (আনাতোলিয়া) এর কোথাও আরবির কোনো অস্তিত্বই আর বাকি থাকেনা। সামান্য কিছু অবশিষ্টাংশ বাদে আরবি কাব্য এবং কথোপকথনের সিলসিলা (উসলুব) সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। দিকনির্দেশনা (যেই নগণ্য আরবি জানা যায়) হল এমন একটি কারিগরি বিষয় যা আরবদের বিজ্ঞান থেকে জানা যায় এবং তাদের কথোপকথন থেকে মুখস্ত করে মনে রাখা হয়। এটি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে যাদেরকে আল্লাহ নিজের তরফ থেকে এর জ্ঞান প্রদান করেছেন। আরবির মূল ভাষা মিশর, সিরিয়া এবং পশ্চিমে বহাল থাকে। কারণ ইসলাম সেখানে আজো আছে এবং এটি (আরবি ভাষা) সেখানে অত্যাবশ্যকীয়। তথাপি, আরবি সেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু ইরাকের কিছু প্রদেশ এবং এর পূর্বের দেশগুলোতে আরবির কোনো অস্তিত্বই আর বাকি থাকেনি। এমনকি বিজ্ঞানের কিতাবগুলো অনারব (ফারসি) ভাষাতে লিখিত হতে থাকে এবং ক্লাসগুলোতে আরবি শেখানোর ক্ষেত্রে ফারসি নির্দেশনার মাধ্যমে শেখানোর পরম্পরা চালু হয়। (উৎস: ইবনে খালদুনের আল মুকাদ্দামাহ এর ৪৭৭-৪৭৮ নং পৃষ্ঠা, ফ্রানয রোজেনথালের অনুবাদ থেকে নেওয়া)

সবশেষে, গ্রানাডার পতনের পরে স্পেনে আরব ইসলামি সাম্রাজ্যের (যা মুসলিম বিশ্বের কাছে আন্দালুস নামে পরিচিত) অবসান ঘটে এবং আরবি ভাষা স্থলাভিষিক্ত হয় (অন্য ভাষার দ্বারা)। শুরুর দিকে ওসমানি সাম্রাজ্যের দাপ্তরিক ভাষা আরবি হলেও পরবর্তীতে (১২৯৯-১৯২২) তা পরিবর্তন করে তুর্কি করা হয়।

এতদসত্ত্বেও আরবি ভাষা সমস্ত চড়াই উৎরাই পারি দিয়ে টিকে রয়েছে। কারণ এমন একটি দূর্গ এর কাছে রয়েছে যেখানে সে সমস্ত দুর্যোগের সময় ফিরে আসতে পারে।

ক্লাসিক্যাল আরবি ভাষা সবসময়ই কুরআনের মজলিস, মসজিদ, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হত। এটিকে ফিকহ, তাফসির এবং হাদিসের মত ইসলামি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের

আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। এসবের উচ্চারণগুলো বিশুদ্ধভাবে ঠিক তেমনভাবে শেখানো হত, যেমননিভাবে রাসুল (সা:) এর সময়ে তা উচ্চারিত হত।

আল্লাহ তা'আলা, যিনি কখনোই নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করেননা, তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন, "নিশ্চই আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।" (সূরা হিজর: ৯)

কুরআন কখনোই পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হতে পারতোনা যদিনা আরবি ভাষা, যেটিতে এটি নাযিল হয়েছে তা সংরক্ষিত না থাকত। অন্যথায়, একজন তিলাওয়াতকারী এর অর্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারতোনা। এটি অবোধ্য থেকে যেত। আর আমরা (আল্লাহর) এই ওয়াদার সত্যতা দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

আরবি ভাষার আন্তজার্তিক স্বীকৃতি

বর্তমানে বিশ্বের ২৮টি দেশে আরবি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আর পৃথিবীতে এই ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে প্রায় ২৮ কোটির ওপরে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরবরা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সেখানে কথা বলার সুযোগ পেত না। কারণ তখন জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। এগুলো হলো ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা ও রাশিয়ান। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো আরব দেশগুলোতে আরবি ভাষায় আলোচনাসভা, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করতে থাকে।

১৯৬৬ সালে ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আরবি ভাষায়ও অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে আরবিকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আরবি ভাষার চর্চা

হিজরি প্রথম শতাব্দীতে আরব-অনারবদের জীবনধারায় সংমিশ্রণ ও আরবি ভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় আরবি বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা এবং কোরআনের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আরবি চর্চা শুরু হয়।

সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সে সময়ের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, ‘ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন ও হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন।

বিভিন্ন নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' (আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৪২৬)

পৃথিবীর যেকোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় ওহি অবতরণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়।

কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার প্রধান মাধ্যম:আরবি ভাষা

কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার চাবি হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বলেন, 'তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দ্বিনের অংশ।' (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবিভাষী। তাই দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবি চর্চা করা দ্বিনেরই অংশ ও দ্বিনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩৪৩)

আরবি ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, 'আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।' (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, 'আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, 'নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।'

আরবি ভাষার উৎকর্ষ সাধনে কুরআনের ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ায় মুসলিম জাতির কাছে আরবি ভাষার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আরবি মুসলমানের ধর্মচর্চা ও ইবাদতের অংশ। ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই মুসলিমরা আরবি ভাষার চর্চা করে। তাই বলা যায়, কোরআনের ভাষা হওয়ায় আরবি ভাষার চর্চা, সংরক্ষণ, প্রসার ও উন্নয়নে পৃথিবীর বৃহৎ একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিকরা আরবি ভাষার ওপর কোরআনের সাতটি অবদান চিহ্নিত করেছেন। তা হলো—

১. বিলুপ্তি ও বিকৃতি থেকে রক্ষা : আরবি ভাষার স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণে কোরআনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা আরব জাতি, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিন্তা ও দর্শনের ওপর কোরআনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। কোরআন তথা ইসলাম বিক্ষিপ্ত আরব জাতিকে সংঘবদ্ধ করেছে, তাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে, তাদের স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তাধারা পবিত্র করেছে।

ফলে কোরআন আরবদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ স্থান লাভ করেছে; বরং কোরআন হয়ে উঠেছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড। কোরআনের এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি কোরআনের অনুরূপ কিছু উপস্থিত করতে মানুষ ও জিন জাতিকে একত্র করা হয়, তবু তারা তার অনুরূপ কিছু উপস্থিত করতে পারবে না। যদিও তারা পরস্পরের সহযোগী হয়।' (সুরা : ইসরা, আয়াত : ৮৮)

২. সমৃদ্ধি লাভ : কোরআন আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।আরবি শব্দের অর্থবোধকতা, শব্দ-বাক্যের নতুন বিন্যাস, উচ্চ ভাষাশৈলী ও অলংকারে শোভিত করেছে তাকে। আল্লামা মুস্তফা সাদেক রাফেয়ি (রহ.) বলেন, 'কোরআন এই ভাষায় এমন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, যার অল্প ও বিস্তর উভয় পরিমাণ সমালোচকদের অক্ষম করে দেয়। কেবল আলোর সঙ্গে কোরআনের তুলনা করা যেতে পারে। কেননা আলো খণ্ডিত হলেও তার প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসে না।' (তারিখু আদাবিল আরব : ২/৭৪)

৩. গোত্রীয় প্রভাব মুক্তকরণ : কোরআন আরবি ভাষাকে গোত্রীয় ও আঞ্চলিকতার প্রভাবমুক্ত করে একটি প্রমিত রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা একই সঙ্গে বিশুদ্ধতম এবং অলংকারপূর্ণ। যদিও কোরআন আরবি ভাষারীতির বৈচিত্র্য অস্বীকার করেনি। এ জন্যই কোরআন পাঠে সাতটি রীতি অনুমোদিত। কোরআন একীকরণের সময় উসমান (রা.) বলেন, 'যদি তোমরা ও জায়েদ ইবনে সাবিত কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করো, তবে কোরাইশের ভাষারীতি গ্রহণ করো। কেননা কোরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।' (লামহাতুন ফি উলিমিল কোরআন, পৃষ্ঠা. ১১৮)

৪. আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা দান : কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে আরবি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। বেশির ভাগ আরব মরুচারী ও বেদুইন হওয়ায় তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষাও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়। ড. নুরুদ্দিন আত্তার বলেন, 'আরবি ভাষার ব্যাপক প্রসার হলো। এমনকি ভারতবর্ষ, চীন ও আফগানিস্তানে আরবি চর্চার উদগিরণ হলো। ইমাম বুখারি, মুসলিম, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহর মতো বিশ্ববরেণ্য আলেমরাই তার প্রমাণ। তাঁরা এসব অঞ্চলের সন্তান ছিলেন।' (আত-তুরাসুল আরাবিয়া, পৃষ্ঠা. ১২৫)

৫. অলংকার ও সাহিত্য সমালোচনার বিকাশ : কোরআন ছিল আরব কবিদের জন্য এক মহাবিস্ময়। কোরআনের অলংকার ও শৈলী তাঁদের হতবাক করে দিয়েছিল। ফলে কোরআন নাজিলের পর আরবি ভাষার কাঠামো ও শৈলী উভয়টি নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়, যা 'ইলমুল বালাগা' (অলংকারশাস্ত্র) ও 'ইলমুল নকদ' (সমালোচনাশাস্ত্র)-এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বরং মুসলিম সমাজে কোরআনচর্চার অংশ হিসেবেই অলংকার ও সমালোচনাশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। ড. তোহা হুসাইন বলেন, 'এতে সন্দেহ নেই, কোরআন আরবি গদ্যের আদি গ্রন্থ। কিন্তু তোমরা এ-ও হয়তো জানো যে কোরআন গদ্য নয়। তদ্রূপ কোরআন কাব্যও নয়। কোরআন কোরআনই। ... কোরআন একটি একক পদ্ধতি, অনুপম ও অতুলনীয়। আগেও এমনটি ছিল না এবং পরেও এর তুল্য কিছু হয়নি।' (মিন হাদিসিশ শেরি ওয়ান নাসরি, পৃষ্ঠা. ২৫)

কুরআনে হরকত ও নুকতার ইতিহাস

কুরআনে নুকতা

আদিকাল থেকেই আরবদের মধ্যে আরবি বর্ণমালায় নুকতা ব্যবহার করার কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। এমনকি তারা লেখালিখিতেও নুকতা ব্যবহার করত না। এতে করে কুরআন তিলাওয়াতে তাদের কোনো সমস্যা হতো না। এর কারণ হলো- কুরআন কখনো অনুলিপি নির্ভর ছিল না; বরং তা হাফেজে কুরআনদের থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করে নিত। এমনকি উসমান (রা.)- এর শাসনকালেও কুরআন ছিল নুকতাবিহীন। তিনি যখন কোনো প্রদেশে কুরআন পাঠাতেন, সাথে একজন হাফেজও পাঠিয়ে দিতেন তা তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু নুকতা ব্যতীত অনারবদের পড়তে কষ্ট হওয়ায় পরবর্তীকালে নুকতা সংযোজন করা হয়। প্রথম কে কুরআন কারীমে নুকতা সংযোজন করেন- তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে- বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী, আবুল আসাদ আদ দুয়ালী (র.) এ মহান কাজটি সম্পন্ন করেন এবং তা করেন আলী (রা.) এর সম্মতিতে।

আবার কারও কারও মতে- কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান আবুল আসাদ দুয়ালীর দ্বারা এ কাজটি সম্পাদিত হয়। কারও কারও মতে, তিনি এ কাজটি আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে সম্পূর্ণ করেন। অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হাসান বসরি (র.), ইয়াসের ইবনে ইয়ামার এবং নসর ইবনে আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

কুরআনের হরকত

প্রথমদিকে নুকতার মতো কুরআনে হরকতও ছিল না। সর্বপ্রথম কার মাধ্যমে কুরআনে হরকত প্রদান করা হয়- তা নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। কারও কারও মতে, সর্বপ্রথম আবুল আসাদ আদ দুয়ালীই কুরআনে হরকত প্রদান করেন। কিন্তু তার আবিষ্কৃত হরকতসমূহ এখনকার প্রচলিত হরকতের মতো ছিল না। তার আবিষ্কৃত হরকতে যবরের জন্য ওপরে এক নুকতা এবং যেরের জন্য নিচে এক নুকতা বসিয়ে দেওয়া হতো। পেশের উচ্চারণের জন্য হরফের সামনে এক নুকতা এবং তানবিনের জন্য দুই নুকতা ব্যবহার করা হতো। আর খলিল বিন আহমাদ হামজা এর সাথে তাশদিদের চিহ্ন তৈরি করেন।

এরপর বাগদাদের শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হাসান বসরী (র.), ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন। হরকতকে সহজবোধ্য

করার জন্য ওপরে, নিচে ও পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহারের পরিবর্তে বর্তমান আকারে হরকত প্রবর্তন করা হয়, যাতে হরফের নুকতা ও হরকতের নুকতার মাঝে মিশ্রণজনিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়।

আরবি ভাষার ধর্মীয় গুরুত্ব

ন্যূনতম আরবি জানা না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে ধর্মীয় জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কেননা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হলো নামাজ।

বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নামাজে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ, তসবিহ-তাহলিল আরবিতেই আদায় করতে হয়। পৃথিবীর লাখ লাখ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আরবিতে আজান দেওয়া হয়। জুমার নামাজের খুতবা, দুই ঈদের জামাতে খুতবা আরবিতে দেওয়া হয়। এ ছাড়া হাদিসের ভাষাও আরবি। এ জন্য ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইলে আরবি ভাষা অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরবি ভাষার গুরুত্ব

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড় শ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ। এদের বেশির ভাগের ভাষা আরবি। আরব দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও খনিজ সম্পদের দেশ। উক্ত দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সন্ধান, ব্যাবসায়িক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো বৈদেশিক রেমিট্যান্স। এর ৬৩ শতাংশ আসে আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো থেকে।

আরব ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যাবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এটি তাঁদের বাণিজ্যিক ভাষা। সুতরাং যাঁরা আরব দেশগুলোতে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের জন্য আরবি ভাষা শেখা খুবই জরুরি।

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব

মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যা আরবি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুসলিম জাতি গঠন ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রকে আরো সহজতর পন্থায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আরবি লেখা, বলা ও বোঝার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

আরবি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আরবি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তার কিছু দিক তুলে ধরা হলো-

১. আরবি ভাষা কুরআন-হাদিসের ভাষা। দ্বীন ইসলামের ভাষা এবং দ্বীন ইসলামের অংশ। রাসুল (সা.) এ ভাষায় কথা বলেছেন। আরবি ভাষার প্রচার-প্রসার দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার। ওমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি শিক্ষা কর। কেননা, আরবি তোমাদের দ্বীনের অংশ।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শিক্ষা কর, তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে।’ ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ‘আরবি ভাষা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তা শিক্ষা করা আবশ্যক। কেননা, কোরআন-সুন্নাহ বোঝা আবশ্যক। আরবি বোঝা ছাড়া কোরআন-সুন্নাহ বোঝা যায় না। আর যার মাধ্যমে আবশ্যকীয় বিষয় জানা যায়, তা জানাও আবশ্যক।’ সুতরাং দ্বীনি দিক লক্ষ্য করে আরবি ভাষা শিখতে হবে।

২. কৌশলগত দিক থেকে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কেননা, আরবি ভাষা পৃথিবীর বিরাট অংশকে দখল করে আছে। সুতরাং আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

৩. আরবি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বিরাট এক অংশ বহন করে আছে। ইতিহাস ও সভ্যতার দিক থেকে এটা প্রমাণিত যে, আরবি ভাষার মাধ্যমেই ইউনানি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার-প্রসার হয়েছে জগতজুড়ে।

৪. আরবি ভাষা গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্য সব ভাষার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। শব্দ, বাক্যগঠন প্রক্রিয়া অথবা উদ্দিষ্ট অর্থের ওপর পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার সক্ষমতা সব দিক থেকেই আরবি ভাষা শ্রেষ্ঠ। এসব দিক লক্ষ্য করে বর্তমানে আরবি ভাষা শুধু মুসলমানরাই শিখছে এমন নয়, বরং ইহুদি-খ্রিস্টানরাও ব্যাপকভাবে শিখছে ও দক্ষতা অর্জন করছে।

৫. বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা বিভাগ রয়েছে। এর জন্য রয়েছে শিক্ষক। তাদের আরবি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরব দেশের ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য পাঠানো হয়।
৬. বিভিন্ন সংস্থা, হাসপাতাল, অফিস-আদালতে আরবি অনুবাদকের প্রয়োজন হয়। তাদের কাজ-কর্ম আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। এ জন্য দরকার দক্ষ আরবি মুতারজিম।
৭. পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে পড়াশোনার জন্য আসে। সেখানে তাদের ভর্তি হওয়া এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের জন্য আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন জরুরি। কেননা, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় দক্ষ ছাত্রদের প্রাধান্য দেয়া হয়।
৮. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবসায়ী মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে। কোম্পানি ও কারখানার মালিকরা আরবি ভাষায় দক্ষ লোকদের খোঁজে। যাদের আরবি ভাষায় মোটামুটি দক্ষতা রয়েছে, তারা ভালো বেতনে ভালো কাজ পেয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে যেসব শ্রমিক ও কর্মচারীর আরবি ভাষায় কোনো ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা না থাকে, তারা বিভিন্ন রকম অসুবিধার মুখোমুখি হয়। ফলে তারা নানা শ্রেণির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতারিত হয়।
৯. আরব দূতাবাসে ভালো বেতনে চাকরির জন্য লোক খোঁজা হয়। এর জন্য আরবিতে দক্ষ ব্যক্তিদের প্রয়োজন। ইংরেজির পাশাপাশি কেউ যদি আরবিতেও দক্ষ হয়, তাহলে সেখানে উঁচু পর্যায়ের পদ পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে পৃথিবীজুড়ে আরবি ভাষার শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে। আরবি ভাষায় সাহিত্যকর্ম যতটুকু হয়েছে, এর সাহিত্যমান যত ওপরে, এ স্তরে পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষা পৌঁছাতে পারেনি। এসব দিক লক্ষ্য করে বর্তমান বিশ্বে আরবি ভাষাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষ আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুধাবন করে। অতএব, আরবি ভাষা শেখায় আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

আরবি ভাষা শেখায় মহানবী (সঃ) যেভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন

আরবি শুধু একটি ভাষা নয়, এটি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম বাহক। কালের বিবর্তনে বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অনেক ভাষা হারিয়ে যেতে পারে। কোরআনের বাহক হিসেবে আরবি ভাষা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কেননা মহান আল্লাহ কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

বাংলাদেশের মতো অনারব দেশগুলোর জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা ইসলামী শিক্ষারই নামান্তর। মানুষ যত বেশি এ ভাষার কাছাকাছি আসবে ততই ইসলামকে জানবে ও বুঝবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'তোমরা আরবি ভাষা শেখো, কেননা এটি তোমাদের দ্বীনেরই অংশ।

সিরাতে আরবি ভাষা শেখার অনুপ্রেরণা : রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাত অধ্যয়ন করলে আরবি ভাষা শিক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারের কিছু পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তা হলো—

ক. আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসা : স্বভাবগতভাবে মানুষ যা ভালোবাসে তা সহজে গ্রহণ করে এবং চর্চা করে। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা আরবদের ভালোবাসো। কেননা আমার ভাষা আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবি।
' (মুসতাদরাকে হাকিম)

সুতরাং আরবি ভাষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা তুলে ধরার মাধ্যমে এ ভাষার প্রতি ভালবাসা তৈরি করতে হবে। তদুপরি ভাষাশিক্ষার আধুনিক, আকর্ষণীয় ও সহজতম পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মন থেকে আরবিভীতি দুর করতে হবে।

খ. আরবি ভাষা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা : শিশুরা সাধারণত দুই বছর বয়স থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে মাতৃভাষা রপ্ত করে ফেলে। যদি এ সময় তাকে বিশুদ্ধ ভাষার পরিবেশ দেওয়া হয় তবে সে সহজেই বিশুদ্ধ ভাষা শেখে। রাসুল (সা.)-এর শৈশবের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টি কেটেছিল তায়েফের বনু সাদ গোত্রের হালিমার ঘরে।
একাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আরবি ভাষাতাত্ত্বিক সালবি বলেন, 'আরবের মধ্যে বনু সাদ গোত্রের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।' পাশাপাশি সহজ-সরল, প্রকৃতিঘনিষ্ঠ ও মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত গ্রামীণ জীবনশৈলীর জন্যও এই গোত্রটি প্রসিদ্ধ ছিল। (আবুল হাসান আলী নদভী, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ)

বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বনু সাদ গোত্রের পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। কেননা আমি জন্মেছি কুরাইশ বংশে আর আমার শৈশব কেটেছে বনু সাদ বিন বকর গোত্রে।' (ইমাম বাগাভি, শরহুস সুন্নাহ)

অন্য এক বর্ণনায় রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি নবী; এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!' (তাবরানি, আল মুজামুল কবির)।

সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। মাতৃভাষার মতো যে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশী কার্যকর। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণের সমন্বয়েই একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। আমাদেরকে আরবি ব্যাকরণভিত্তিক পদ্ধতি ছেড়ে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বতস্ফুর্তভাবে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

গ. আরবি কবিতাচর্চা : যেকোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার বিখ্যাত লেখকদের সাহিত্য পড়া, চর্চা করা ও মুখস্থ করার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাতে এ বিষয়ে চমৎকার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তী আরবি সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা জাহেলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু বক্তৃতা, লোকমুখে প্রচলিত কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও ওসিয়তনামাকে প্রাচীন আরবি গদ্যের নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে কবিতাই যে তৎকালীন আরবি সাহিত্যের প্রধানতম বাহন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই কবিতাকে আরব সমাজের দর্পন বলা হয়। সে সময় আরবি সাহিত্য বলতে শুধু কবিতাকেই বোঝানো হতো। কোরআনের ভাষা বোঝার জন্য আরবি কবিতা শেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসুল (সা.) বলেন, 'যদি তোমাদের কাছে কোরআনের কিছু (শব্দের অর্থ) অস্পষ্ট মনে হয়ে তবে তা কবিতায় অনুসন্ধান কোরো। কেননা কবিতা আরবদের (ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা সংস্কৃতির) দিওয়ান বা আকরগ্রন্থ।' (মুসতাদরাক হাকিম)

রাসুল (সা.) নিজে কবিতা চর্চা না করলেও সাহাবিদের মধ্যে যারা কবিতা চর্চা করতেন তাদের উৎসাহিত করতেন এবং সেই সময়ের বিখ্যাত কবিদের কবিতার শ্লোক আবৃতি করতেন।

শামায়েলে তিরমিজিতে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) বলেন, 'আরব কবিদের বলা সবচেয়ে সুন্দর কবিতা হচ্ছে কবি লবিদের এ পংক্তিটি 'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মিথ্যা ও বাতিল, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই নি:সন্দেহে হবে বিলীন।'।

একবার রাসুল (সা.) এর এক আঙ্গুল মোবারককে আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছিলো, তখন তিনি একটি আরবি কবিতার এ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন- 'তুমি তো একটি আঙ্গুলমাত্র, রক্তাক্ত হয়েছো, তুমি যে আঘাত পেয়েছো তা তো আল্লাহ পথেই' (শামায়েলে তিরমিজি)।

একবার এক বেদুইনের অলঙ্কারপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) বলেন, 'কিছু কথায় যাদু আছে, কিছু কবিতায় আছে প্রজ্ঞা।'

এ ছাড়াও রাসুল (সা.) এর মজলিশে অনেক সাহাবী কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অনেককে পুরষ্কৃত করতেন। অনেককে উৎসাহিত করতেন। হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কে 'রাসুলের কবি' বলা হতো। তিনি তার শাণিত কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের তীর্যক কথামালা ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার উপযুক্ত জবাব দিতেন। রাসুল (সা.) তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন,'তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের কথার জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে জিবরাইলের মাধ্যমে সাহায্য কর' (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

একবার এক বেদুইনের অলংকারপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) বলেন, 'কিছু কথায় জাদু আছে, কিছু কবিতায় আছে প্রজ্ঞা।'

ঘ. বিশুদ্ধ আরবি ভাষাচর্চায় মনোযোগী হওয়া : রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!' (তাবরানি, আল মুজামুল কাবির)

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় রাসুল (সা.) ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি কতটা যত্নশীল ছিলেন। এ ছাড়া 'মুসনাদুশ শিহাব' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) তাঁর চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বিশুদ্ধ ভাষার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'পুরুষের সৌন্দর্য হচ্ছে তার ভাষার বিশুদ্ধতা।'

বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষার জন্যই আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র তথা নাহু ও সরফের উৎপত্তি হয়েছিল। আরবি ভাষার সৌন্দর্যচর্চার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল আরবি অলংকারশাস্ত্র বা ইলমুল বালাগাহ। সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার চর্চাও রাসুল (সা.)-এর অন্যতম শিক্ষা।

আরবি ভাষা শিক্ষার ৭টি কারণ

১। অনুবাদ ছাড়াই রবের কথা বুঝতে পারা:আমাদের প্রিয় কোনো ব্যক্তি যদি ভিনদেশী ভাষায় আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠাতো, তাহলে আমরা এর পাঠোদ্ধারে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতাম। আমরা এর অনুবাদ করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এর সত্যিকার বক্তব্য মূল ভাষাতেই কেবল পুরোপুরি বোঝা সম্ভব। কোরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষা অর্থের দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ আর পরিপূর্ণ যে, কোনো অনুবাদই এর মূল ভাবের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।

২। নবীজী (সাঃ) এর কথা বুঝতে পারা :ভাবুন তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সরাসরি আরবিতে বুঝতে পারলে কত ভালো লাগবে! আরবি জানার অর্থ হলো রাসূলের হাদীসগুলো কোনো অনুবাদের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে পারা।

৩। সালাতে খুশু বৃদ্ধি করা

সালাতে আপনার মনোযোগ বেড়ে যাবে। কারণ সুরাহ থেকে শুরু করে তাসবিহ-তাহমিদ সহ সালাতের প্রতিটা কথাই আপনি বুঝে বুঝে পড়তে পারবেন। তখন আপনার সালাত কেবল অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন না হয়ে রবের সাথে আপনার এক অর্থপূর্ণ কথোপকথনে পরিণত হবে। এছাড়া তারাবীহ সালাতের সময় কি আপনার কখনো মনে হয়নি "ইশ! ইমাম সাহেব কী পড়ছেন তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!"? আপনার সেই স্বপ্নকে সত্যি করুন আরবি শেখার মাধ্যমে।

৪। গভীর ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়তে পারা

যদিও ইসলামী শাস্ত্রের অনেক বই-ই এখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তারপরও কিছু বইয়ের গভীরতা কেবল এর মূল ভাষাতেই অনুধাবন করা সম্ভব। হোক তা কোরআনের তাফসির, হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব।

৫। এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা

পৃথিবীর ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষাভাষী। ২৪টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবি। আরবি শেখার ফলে আপনি সারা পৃথিবীর আরবি ভাষাভাষিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। (এর ফলে আপনার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে।–অনুবাদক)

৬। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে একাধিক ভাষা জানা ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। আরবি ভাষার দখল আপনার সামনে কর্মের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দেবে।

৭। নতুন ভাষা শেখার ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়

বর্ণিত আছে যে ঊমার (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেছেন, "আরবি ভাষা শিক্ষা করো। এর ফলে অন্তর শক্তিশালী হয়।" গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দ্বিভাষী ও বহুভাষীগণ ভাবের আদান প্রদানে অধিক দক্ষ হন। তাঁদের স্মরণশক্তি ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

যে দশটি কারণে মুসলিমদের আরবি ভাষা শিখা উচিত

১। সর্বশক্তিমান এবং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব,বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ভাষাগুলো থেকে আরবিকে একচ্ছত্রভাবে বেছে নিয়েছেন সৃষ্টিজগতের কাছে তার বাণী পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে। এই একটি সত্যই মুসলিমদের আরবি শেখার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই অন্য কোনো একটি ভাষায়ই শুধু নয় বরং অন্য সমস্ত ভাষাতেই কুরআন নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের পবিত্র কুরআনে বলেন,''নিশ্চই আমি একে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।" এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আরবির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। আর আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ রহস্যগুলো এমনভাবে প্রচার করে যা অন্যান্য ভাষার দ্বারা সম্ভব নয়। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই আরবিকে এসব অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং অন্যান্য ভাষার উপরে একে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

২। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাহলে প্রতিটি মুসলিমেরই কি উচিত নয় আরবি ভাষা শিক্ষা করা যেন সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বাণী উপলব্ধি করতে পারে? এই কুরআন যদিও এই পৃথিবীতে বিদ্যমান, কিন্তু এর উৎপত্তি এই পৃথিবীতে হয়নি। বরং এটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। মহান আল্লাহ নিজেই বলেন, "নিশ্চই এটি(আল-কুরআন) সেই সত্ত্বার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি মহা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।" তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে একজন মুসলিম এই দুনিয়াতে অনেককিছু করার সময় পায় অথচ সে আল্লাহর পবিত্র কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) সুন্নাহ যেই ভাষায় এসেছে তা শেখার সময় পায়না? আমাদের মধ্যে অনেকেই সময়, শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে দুনিয়াবি অনেক বিষয়াদি শেখে। অথচ সেই তুলনায় আখিরাতের বিষয়গুলো শেখার জন্য কোনো সময়ই ব্যয় করেনা। আমরা যদি সত্যকার অর্থেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের(সাঃ) পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হই তবে আমাদের এক সেকেন্ডও দেরি করা উচিত নয় আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) এর সুন্নাহর ভাষা শেখায় মনোনিবাস করায়। কুরআন এবং সুন্নাহ কতো মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ন। অথচ আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং বঞ্চিত থাকাকেই বেছে নেয়।

৩। কুরআন অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ। অনেক আলেমই এর কারণ হিসেবে এর ভাষাকেই গণ্য করতেন। এমনকি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র গড়েই উঠেছে কুরআনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনার উদ্দেশ্যে। এই শাস্ত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে কুরআন বাগ্মীতা ও অলঙ্কারবিদ্যার সর্বোচ্চ চূড়ার প্রতিচ্ছবি বহন করে। এটি রচনাশৈলীর দিক থেকে অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে কুরআনের এই রচনাশৈলীর সমাদর করার জন্য আগে থেকেই জানা

দরকার আরবি ভাষার জ্ঞান। তাই যারা আরবি ভাষা শেখেনি তারা চিরকাল কুরআনের রচনাশৈলী ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৪। আরবি ভাষায় বর্ণিত কুরআন এবং সুন্নাহ বাদেও ইসলামের অনেক সমৃদ্ধ সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলো থেকে এসেছে। আরবি ভাষা না জানার কারণে আমরা নিজেদেরকে ১৪০০ বছরের ইসলামি জ্ঞান-গরিমা থেকে বঞ্চিত করছি। এই জ্ঞানের সমটুকুই ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর উপকারে এসেছে। ইসলামি মূলনীতিগুলো রক্ষা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। আর তা হয়েছে ইসলামের প্রচার প্রসারের পরপরই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলো আজও পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে এবং মজলিসে পড়ানো হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের ঐতিহ্য আরো প্রচার-প্রসার হচ্ছে। পূর্ববর্তী আলেমদের অবদান না থাকলে আমরা ইসলামকে এখন যেভাবে পেয়েছি সেভাবে পেতাম না। আল্লাহ যেন তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দান করেন, ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের অবদানের প্রতিদানস্বরূপ।

৫। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু শাখা সুনির্দিষ্টভাবে আরবি ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় ভাষাগত। এই বিষয়গুলো বুঝতে হলে আরবি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিষদ জ্ঞান থাকতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাফসিরশাস্ত্র, হাদিসশাস্ত্র, ফিকহশাস্ত্র,আকিদাশাস্ত্র। এর কারণ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ এবং উভয়ের ভাষা আরবি। তাই এদের বাণীকে উদঘাটন করতে হলে, বিশেষভাবে কুরআনের সূক্ষ ভাষাগত অলঙ্কারের মর্ম বুঝতে হলে একজনকে অবশ্যই আরবি ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে যা এই কাজকে সম্ভবপর করবে। কারণ তাফসির কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদিসশাস্ত্র বস্তুত রাসুল(সাঃ) এর হাদিসের ব্যাখা-বিশ্লেষণ। ফিকহশাস্ত্র তেমনিভাবে কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আইন কানুনের বর্ণনা। আকিদাহ হলো কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিশ্বাসমালার সমষ্টি। উপরের উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে এই প্রতিটি শাখা-প্রশাখা কুরআনের ভাষারই বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এবং ইসলামের বিভিন্ন শাখার আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়াও বিরল ঘটনা নয়। কারণ একেকজন একেকভাবে একটি আয়াত বা হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নিজে যেভাবে আয়াতটির অর্থ ও ব্যাখা বুঝেছেন সেভাবে।

৬। উমার(রাঃ) বলেন, “সুন্নাহ এবং আরবি ভাষা শিখো। কুরআন আরবি ভাষাতেই শিখো কারণ এর ভাষা আরবি।”

তিনি আরো বলেন, “আরবি শিখো কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ। এবং শিখে নাও কিভাবে বিগত লোকদের সম্পদ(ফরয কাজগুলো) বন্টন করতে হয়। কারণ এগুলো তোমাদের দ্বীনের অংশ।”

ইমাম শাফেয়ি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি ২০ বছর যাবত আরবি ভাষা শিখেন(সবচেয়ে বিশুদ্ধ উৎসগুলো থেকে) যাতে তিনি কুরআন বুঝতে পারেন।

কিছু কিছু আলেম উল্লেখ করেন যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এই বিধানের কারণ হলো কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যেহেতু আরবি ছাড়া সেই জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় সেহেতু আরবি শিখাও বাধ্যতামূলক।

আল আইমুই বলেন,ইলমের ছাত্রদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে ভয় করি যেই বিষয়ে তা হলো তারা সেই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে না জেনে হাদিসে উল্লিখিত সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যাদের সম্পর্কে রাসূল(সাঃ) বলেন, “যে কেউ আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা ছড়ায় সে যে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।“ যেহেতু আল্লাহর রাসূল(সাঃ) ব্যাকরণগত ভুল করতেন না সেহেতু তুমি তার কাছ থেকে যা কিছু বর্ণনা করবে তাতে যদি ব্যাকরণগত ভুল থাকে তাহলে তুমি তার নামে মিথ্যারোপ করলে।“

৭। আরবি ভাষার জ্ঞান একজন ব্যক্তির নিষ্ঠা এবং ইবাদতকে অনেক বেশি অর্থবহুল করে তোলে বিশেষভাবে সালাত আদায়ের সময়, কুরআন তিলাওয়াত বা শোনার সময়, খুতবা শোনার সময়, দুআ করার সময়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে বলা যায় যে আরবি ভাষা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং আমাদের মাঝে কোনো আয়োজক বা তরজমাকারীর প্রয়োজনকে নাকোচ করে দেয়। অন্যভাবে বলা যায় আরবি ভাষার জ্ঞান আমাদেরকে সরসরি কুরআন এবং সুন্নাহ শোনা ও বোঝার ব্যবস্থা করে দেয়।

উপরন্তু কুরআন শুধুমাত্র এর অর্থগত অনুবাদের নাম নয়। বরং এটি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা শব্দের অর্থের সমষ্টি হিসেবে বিবেচ্য। এর অর্থ হলো, একটি অনুবাদ কুরআনের আসল অর্থের যতই কাছাকাছি হোকনা কেনো, সেটি কখনোই কুরআনের সমতুল্য হবে না যা হচ্ছে মহাজাগতিক এবং আল্লাহর অসৃষ্ট বাণী। একটি অনুবাদ সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হলো অনুমান। অর্থাৎ মানুষ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে যতটুকু অনুমান করতে পারে। এই অনুমানও হচ্ছে সীমাবদ্ধ যা কখনোই মহান আল্লাহর অসীম বাণীর পরিপূরক হতে পারেনা। আল্লাহর এই আয়াতকে একটু বিবেচনা করে দেখুন। আল্লাহ বলেন, “বলুন(হে মুহাম্মাদ(সাঃ)),যদি সমুদ্রগুলো কালি হতো আপনার রবের বাণী লেখার উদ্দেশ্যে তবে তা ফুরিয়ে যেত আপনার রবের বাণী লিখে শেষ করার পূর্বেই। যদিও এর সাথে আরো সমুদ্র যোগ করা হয়।” আল্লাহ আরো বলেন, “যদি পৃথিবীর গাছগুলো কলম হতো এবং সমুদ্রগুলো(কালি হতো), এবং আরো সাত সমুদ্র এর সাথে যোগ করা হতো তবুও আল্লাহর বাণী লিখে শেষ হবেনা। নিশ্চই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।“ উপরন্তু অনুবাদের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার (যা নিজেই ত্রুটিপূর্ন কারণ মানুষ তার অনুমান অনুযায়ী অনুবাদ করছে) অর্থ হলো একজন ব্যক্তি সর্বদাই কুরআনের সত্যিকারের প্রভাব, ঐশর্য এবং অনবদ্য মাধুর্য থেকে

বঞ্চিত হচ্ছে। কুরআনের নিছক অনুবাদ মানুষের চোখকে অশ্রুসিক্ত করে না। বরং অন্তরে কাপুনি জাগানো শব্দগুলো এবং অর্থের পরিপূর্ণ মাধুর্য মানুষের চোখে অশ্রু বয়ে আনে।

৮। অনুবাদসমূহের সমস্যাগত দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে যৌক্তিক কারণেই মুসলিমদের আরবি শিখা উচিত। আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যের বেশিরভাগই অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য নয়। উপরন্তু অনুবাদগুলোর ত্রুটি আর সীমাবদ্ধতা তো আছেই। তা নিম্নমানের অনুবাদ থেকে শুরু করে ভুল ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৯। ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এর অনবদ্য প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। ঠিক তেমনি আরবি যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এরও কিছু ইসলামী প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কুরআন এবং সুন্নাহ আরবি ভাষার উপর গভীর এবং সুদূরপ্রসারী দাগ কেটে গেছে। তাইতো আরবির মৌলিক বিষয়বস্তু ১৪০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

১০। কিছু কিছু প্রাচ্য ভাষাবিদ ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষবশত আরবি ভাষা শিখেছে যাতে তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে পারে এবং মুসলিমদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে। তাহলে মুসলিমরা কেন তাদের ইমান এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় চেতনাদীপ্ত হয়ে ইসলামকে সমস্ত অনৈসলামিক শক্তি এবং ইসলামের শত্রুদের থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আরবি চর্চা করেনা? তাই মুসলিমদের উচিত বেশি বেশি করে আরবি ভাষা চর্চা করা।

আরবি ভাষা শিক্ষার আরো কিছু কারণ

আরবি ভাষা শেখার অনেকগুলো কারন রয়েছে।

প্রথমটা অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবি ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবি ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। তিনি বলেন,

إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرْآنًاعَرَبِيًّالَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কোরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (কুরআন ৩৪:৩)

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মূখ্য নয়। মূখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاإِلَيْكَ قُرْآنًاعَرَبِيًّالِّتُنْذِرَأُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। (কুরআন ৪২:৭)

তাহলে প্রশ্ন আসে যে অনারবরা যাদের ভাষা আরবি নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ, তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْيَسَّرْنَاالْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। (কুরআন ৫৪:১৭)

দ্বিতীয়ত, আরবি জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা কদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করি,

إِنَّاأَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِالْقَدْرِ [৯৭:১] وَمَاأَدْرَاكَ مَالَيْلَةُالْقَدْرِ [৯৭:২] لَيْلَةُالْقَدْرِخَيْرٌمِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [৯৭:৩]

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি "লাইলাতিল কাদরি" পরের আয়াতগুলোতে "লাইলাতুল কাদরি"। যারা আরবি জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে "লাইলাতিল" ও পরের দু'টিতে "লাইলাতুল"। এমনিভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কোথাও মু'মিনুন আবার কোথাও মু'মিনিন। সাধারণভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য, কিন্তু আরবি জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।

তৃতীয়ত, কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবি না জানলে আপনাকে আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুন সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরণ করা সম্ভব হয়না।

চতুর্থত, কুরআনের অনেকগুলো আলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হল তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবি ভাষা বোঝা ব্যাতিত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সূরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَافَأْتُوابِسُورَةٍمِّن مِّثْلِهِ

যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (কুরআন ২:২৩)

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সূরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবি জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায়, কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবি জানার বিকল্প নাই।

বাংলাদেশে আরবি ভাষার আগমন

বাংলাদেশের সাথে আরবি ভাষার পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে বাণিজ্য সূত্রে। আরব বণিকেরা বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সন্দ্বীপে পৌঁছতেন এবং সেখান থেকে মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন পর্যন্ত যেতেন। আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও বাণিজ্য সূত্রে তারা এ দেশে আসতেন এবং তাদের সাথে আসতেন ধর্মপ্রচারকেরা। এভাবে প্রাচীনকালে আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে বাংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার সাথে পরিচিত হয়। কালক্রমে এ দেশীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলাম প্রচারকেরা নামাজ আদায়ের জন্য যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার মিশ্রণ শুরু হয়। বাংলাপিডিয়ায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামাঞ্চল বিশেষত বৃহত্তর চট্টগ্রামের উপভাষার মোট শব্দের প্রায় অর্ধেক আরবি বা আরবি শব্দজাত। তবে বাস্তবতা হলো- ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরব বণিক আর ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বহুকাল আগে থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চা শুরু হলেও আজো তা ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত আরবি ভাষা চর্চার পরিবেশ এখনো এ দেশে তৈরি হয়নি।

বাংলাদেশে আরবি ভাষার প্রসার

ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক বেশ পুরনো। এ দেশের শতকরা ৮৫ শতাংশ মানুষ ইসলামকে হৃদয়ে লালন করে, অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। বাংলাদেশে মাটির সঙ্গে মিশে আছে ইসলামের সৌরভ। পরতে পরতে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের নানা নিদর্শন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ দেশের মুসলমান বেড়ে ওঠে। একসময় যাপিত জীবনের ইতি টানে ইসলামি পরিবেশে। জন্মের পর আজান থেকে মৃত্যুর জানাজা সবই হয় ইসলাম মেনে। পাড়ার মক্তব থেকে শিশুদের অন্তরে ইসলামপ্রীতির বীজ বুনে দেওয়া হয় সযতনে। সেই সাহাবায়ে কেরামের কাল থেকে এই

বাংলাদেশ ইসলামের সুশীতল ছায়া পেয়ে ধন্য হয়ে আসছে। পীর-আউলিয়া ও বণিক-সুফিদের নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতি কাজের বরকতে আজও এ মাটির মানুষ হয় মননে-মানসে ইসলামপ্রিয়। আমলে-আখলাকে দ্বীনদার। দিল-মন উজাড় করে ভালোবাসে কোরআন ও সুন্নাহকে, ভালোবাসে কোরআন-হাদিসের ভাষা আরবিকে।

বাংলাদেশের মাটিতে ইসলাম যেদিন থেকে সূচিত হয়েছে, সেদিন থেকেই এ দেশের মাটি ইসলামের ভাষা আরবিকে খুব কাছ থেকে দেখতে শুরু করেছে। ইসলামের অব্যাহত বিজয়ধারার কল্যাণে, দ্বীনের খাতিরে ও ব্যবসার তাগিদে আরবের আউলিয়ায়ে কেরাম ও বণিক শ্রেণি এ দেশে আসেন। এ দেশের মানুষের সঙ্গে মেশেন। ইসলামের দাওয়াত দেন এবং শরিয়ত শেখান। আর বণিক শ্রেণি হাটবাজারে ব্যবসায়ী কাজে মনোযোগী হন। তবে ইসলামের দাওয়াত হোক কিংবা হাট-বাজারের ব্যবসা তাদের সবই ছিল আরবি ভাষায়।

ইসলামের মহান আদর্শ ও তার জোর প্রচার-প্রসারের ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। ব্যবসা ও ইসলামের কল্যাণে আরবদের সঙ্গে এ দেশের মানুষের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। অল্পদিনেই দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কালের আবর্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এ দেশের শহরে-বন্দরে। যার অনিবার্য ফলে ছড়িয়ে পড়ে আরবি ভাষাও। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হতে থাকে কোরআন-হাদিসের শব্দ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় আরবি শব্দ-বাক্যের ব্যবহার।

গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় শব্দসংখ্যা সোয়া লাখের মতো; যার এক হাজার ইংরেজি ও চারশোর মতো তুর্কি। বাকি দশ হাজার শব্দই আরবি ও ফারসি। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন বাংলা ভাষার ৩০ শতাংশ শব্দ আরবি। বাংলা একাডেমির ২০১৫ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে 'এ পর্যন্ত বাংলায় চার হাজার আরবি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।'

নিজেদের অজান্তেই নানা প্রয়োজনে দৈনিক আমরা অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার করছি। ধর্ম, প্রশাসন, আইন-আদালত, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি সবখানে আছে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবির বিরাটসংখ্যক শব্দের উপস্থিতি; যার কিছু রয়ে গেছে আরবির আসল রূপে, কিছু আছে পরিবর্তিত পোশাকে। যেমন : ইমান, আখেরাত, কোরআন, জান্নাত, জাহান্নাম, উকিল, এজলাস, খারিজ, রায়, উস্তাদ, কলম, তাওফিক, তালিম, মজলিস, মাহফিল, কবর ইত্যাদি সবই আরবি

ভাষার শব্দ। ধর্মীয় বিষয়সমূহ শেখানোর জন্য যখন থেকে ভারত উপমহাদেশে একের পর এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে, সেই সঙ্গে শুরু হয় অ্যাকাডেমিকভাবে আরবি ভাষা পাঠদান।

ইসলামি শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা লক্ষাধিক, যেখানে সন্তানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষা শেখানো হয়। বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাজারের অধিক। এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামি আইন, শরিয়ত, কোরআন, হাদিস তাফসিরসহ অন্যান্য ইসলামি বিষয়ের পাঠদান দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে আরবি ভাষায় পারদর্শী আলেমদের মাধ্যমে সরকারি খরচে বহু শিক্ষার্থীকে 'আইটি টাচ ইন কওমি মাদ্রাসা'র ব্যানারে আরবি ভাষা শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারা পরে আরব বিশ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রেমিট্যান্সযোদ্ধা হয়ে দেশের অর্থনৈতিক খাতকে করবে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ইসলামি স্কলারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আল্লাহর মেহেরবানিতে প্রতিনিয়ত আরবি চর্চা ও ধর্মীয় গবেষণার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ফলে স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা পর্যন্ত ব্যাপকহারে এ ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও আরবি ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এভাবেই বাংলাদেশ আরবির লক্ষণীয় জাগরণ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আমরা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, মতামত ও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য আরবি শব্দ ব্যবহার করি।
অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আমরা আরবি ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। এভাবে নানা কারণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবি ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।যেমন-

১. মুসলিম দেশ হিসেবে ধর্মীয় প্রয়োজনে: বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ হওয়ায় দৈনন্দিন ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষাশিক্ষা ও চর্চার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়। নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, হাদিস, তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও ফিকাহর (ইসলামি আইন) বিধিবিধান সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের বিশুদ্ধ ও মৌলিক জ্ঞান সবই আরবি ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া সভ্যতাওসংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে গবেষণালব্ধ

ইসলামের বিধিবিধান জানার মুখাপেক্ষী হতে হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ ফিকাহ একাডেমি ও ইসলামি আইন গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে অবস্থিত। সেখান থেকেই সাধারণত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই ইসলামের সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই জরুরি।

২. অধিক রেমিট্যান্স অর্জন :অধিক রেমিট্যান্স অর্জনের লক্ষ্যে এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতনভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রফতানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসত। এ দিক বিবেচনায় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই দেশে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করে এ ভাষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন।

৩. কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে: আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবিভাষী হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

৪. ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে: ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ থেকেই এ দেশের সাথে আরবদেশের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ আরবেরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বে ট্রেড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বিশাল ভূখণ্ডের আরব বিশ্বে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের জন্য আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে আরবী ভাষা, এর গুরুত্ব ও উম্মতের পুনর্জাগরণে এর ভূমিকা

ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক:উমর (রা) আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে চিঠিতে লিখেছিলেন, "সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও আরবীর জ্ঞান অর্জন কর এবং কুরআন আরবীতে অধ্যয়ন কর কারণ এটা আরবী।"

আরেকটি বর্ণনায় উমর (রা) বলেন, "আরবী শেখ কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ"। তিনি আরো বলেছেন, "কারো কুরআন পড়া উচিত নয় ভাষার জ্ঞান ছাড়া"।

উবাই বিন কা'ব (রা) বলেছেন, "আরবী ভাষা শেখ ঠিক যেভাবে তোমরা কুরআন হিফজ করা শেখ"।

আলী (রা) যখন কুফায় তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন সেখানে তিনি নতুন একধরনের আরবীর চর্চা দেখতে পান। এতে তিনি বেশ চিন্তিত হন এবং তিনি তৎকালীন আরবী পন্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালীর সাথে বৈঠক করেন এবং তাকে আরবী ভাষার মৌলিক নীতিসমূহ বিশ্লেষন করেন। ইবনু কাছীর (রহ) তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন,

"আবুল আসওয়াদ হচ্ছে তিনি যাকে নাহুজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এবং বলা হয়, যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে তিনি প্রথমদিককার একজন। তিনি তা আমীর-উল-মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হতে গ্রহণ করেছেন।"

ইমাম শাফেঈ' আরবী ভাষার জ্ঞান থাকাকে ফরজে আইন মনে করতেন এবং তিনি তার আরব ছাত্রদের আরবী ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করার তাগিদ দিতেন। তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, "নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান অন্বেষনকারীদের ব্যপারে এই ভয় পাই যে তারা আরবী ভাষার নাহু (ব্যকরণ) সঠিকভাবে জানবে না এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই হাদীসের (বাস্তবতার) মধ্যে প্রবেশ করবে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন (জাহান্নামের) আগুনের মধ্যে তার আসন খুজে নেয়'"। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহও ইমাম শাফেঈ'র মতো অনেকটা একই মত পোষন করতেন। তার মতে যেহেতু একজন মুসলিমের জন্য কুরআন সুন্নাহ বোঝাটা আবশ্যক সেহেতু "অত্যবশ্যকীয় কিছু পালন করার জন্য যা প্রয়োজন তাও অত্যাবশ্যক"-এই নীতি অনুযায়ী আরবী ভাষা শেখাও আবশ্যক। তিনি আরো বলতেন, "আরবী ভাষা ইসলাম ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম।"

মু'জিযা

২৮ টি হরফ। এ কটি হরফ ও এর দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। আমরা জানি, কুরআন একটি মু'জিযা যা মানবজাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জসরূপ। এবং অন্যান্য নবী-রাসূলদের মু'জিযার সাথে কুরআনের পার্থক্য হচ্ছে, অন্যান্য নবী-রাসূলদের সময়

শেষ হলে তাদের মু'জিযারও সমাপ্তি ঘটত, কিন্তু কুরআন একটি চলমান মু'জিযা যার সমাপ্তি হয়নি। যদিও কুরআনের মু'জিযা হওয়াটা আমাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এ বিষয়টি শুধু জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞতা দ্বারা নয় (But this is only through knowledge, not through experience) । একমাত্র আরবী ভাষা শেখা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি অর্জন করা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিকভাবে এ ভাষার অবহেলা ও এর পরিনাম

মুসলিমদের পতনের পেছনে যেভাবে কাফেরদের চক্রান্ত ছিল, ঠিক একইভাবে মুসলিমদের মধ্যেও বেশ কিছু দূর্বলতা দেখা দিয়েছিল। এবং এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম এক কারণ হলো আরবী ভাষার প্রতি অবহেলা। যদিও মুসলিমরা এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, কাফেররা ঠিকই এ ভাষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। এ জন্যই তারা আরব-তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ লাগানোসহ আরো অনেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। শাইখ তাকী (রহ) তার বই "ইসলামী রাষ্ট্র"-তে বলেন:

"এরপর ইসলামের শত্রুরা আরবী ভাষার উপর আক্রমণ চালায়। কারণ, এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম আহকামকে প্রচার করা হয়। তাই, তারা ইসলামের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ককে ছিন্ন করতে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। কিন্তু, প্রথমদিকে তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, প্রথমদিকে মুসলিমরা যে দেশই জয় করেছে সেখানেই তারা কোরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে। বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শীতা অর্জন করেছে যে, তারা ইসলামের প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছে। যেমন, ইমাম আবু হানিফা। কেউ কেউ বা হয়েছে অত্যন্ত উচুঁ মাপের কবি, যেমন, বাশার ইবন বুরদ। আবার, কেউ বা হয়েছে প্রখ্যাত লেখক, যেমন, ইবন আল-মুকাফফা'। এভাবেই, মুসলিমরা (প্রথমদিকে) আরবী ভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। ইমাম শাফেঈ' কুরআনের কোন ধরনের অনুবাদ বা অন্য কোন ভাষায় সালাত আদায় করাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবার, যারা কুরআন অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন, যেমন, ইমাম আবু হানিফা, তারা অনুবাদকে কুরআন হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে আরবী ভাষা সবসময় মুসলিমদের মনোযোগ ও গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ ভাষা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক অংশ এবং ইজতিহাদের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়। আরবী ভাষা ব্যতীত উৎস থেকে ইসলামকে বোঝা অসম্ভব এবং এ ভাষা ব্যতীত শরীয়াহ্ থেকে নির্ভুল ভাবে হুকুম-আহকাম বের করাও সম্ভব নয়। কিন্তু, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে,

আরবী ভাষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কারণ, এ সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় আসে যারা আরবী ভাষার প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের আরবী ভাষার উপর দখল কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যেকোনো বিষয়ে শরীয়াহ্র হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবী ভাষা একটি। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই পর্যায়ে, আরবী ভাষা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের শরীয়াহ্ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট হয়ে যায় শরীয়াহ্ আইনকানুন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামী রাষ্ট্রকে দূর্বল ও রুগ্ন করে ফেলতে এ বিষয়টি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পক্ষে নতুন নতুন সমস্যা সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগুলোর মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে। একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় কিংবা সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এভাবে, সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একসময় অন্তহীন সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে।"

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় এ ভাষা অবহেলার পরিনাম কতটা মারাত্মক ছিল।

এ ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য

অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ আরবীতে যেমন সম্ভব অন্য ভাষায় তেমন সম্ভব নয়। আরবীতে প্রবাদ রয়েছে (خَيْرُ الكَلامِ ما قَلَّ وَدَل) অর্থাৎ উত্তম কথা হলো সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ। কুরআন ও হাদীস এমনি সব সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা)ও বলেছেন, 'আমাকে (جَوَامِعَ الْكَلِم) দেওয়া হয়েছে' [৯] অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীর জ্ঞান দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাকে। এ বিষয়টির উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"উপহার বিনিময় কর, একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে।" [১০] অর্থাৎ উপহার বিনিময় করলে পারস্পরিক ভালোবাসা-সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

এ ভাষার বর্ণনাশৈলী এত চমৎকার যে তা শ্রোতার কাছে ছবির মতো ধরা দেয়। এবং পবিত্র কুরআনে এ রকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে। উদাহরণসরূপ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ~ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বল। তাদের উপর রহমত (ভালবাসা/স্নেহ/দয়া/মমতা/করুনা) দিয়ে তোমার নতজানু হয়ে থাকা বিনয়ের ডানা মেলে দাও এবং বল: হে প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।" [বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪]

এ ভাষার এক অসামান্য সামর্থ্য রয়েছে অন্যান্য ভাষাকে গ্রাস করে ফেলার যখন তারা এর নিকটে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ দাওয়া নিয়ে যে অঞ্চলেই গেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই সে অঞ্চলের লোকজনের ভাষা সহজেই আরবীতে পরিনত হয়েছে। এর ফলে খিলাফতের অভ্যন্তরে অনেক অনারব আরবীতে অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তিত্বে পরিনত হয়েছে। এমনকি আরবী ভাষার ব্যকরণের পথিকৃত সিবাওয়েও একজন অনারব ছিলেন। পরবর্তীতেও অনেক যুগ পর্যন্ত এ ধারা বজায় ছিল। কোনো অঞ্চলে অবহেলার কারণে এ ভাষা প্রতিষ্ঠা না হতে পারলেও সে অঞ্চলের বিদ্যমান ভাষার উপর ব্যপক প্রভাব বিস্তার করে গেছে এ ভাষা যা এখনও বিদ্যমান।

এ ভাষার আরো একটি সামর্থ্য হচ্ছে, এ ভাষা বিদেশী কোনো ভাষার শব্দকে আরবী শব্দতে রূপান্তর করতে পারে। অন্যকথায়, এ ভাষা অন্য ভাষার শব্দ Arabize তথা (مُعَرَّب) মু'আর্রাব করতে পারে। এ ভাষায় শব্দ ও এর আরবী রূপান্তর নিয়ে ইজতিহাদ করার জন্য জ্ঞানের আলাদা শাখা রয়েছে।

উম্মাহর পূনর্জাগরণ

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে উচ্চকিত করেন আর অন্যান্যদের করে দেন নিচু। [মুসলিম]

পূনর্জাগরণ বস্তুগত বা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের মধ্যে নিহিত নেই। বরং চিন্তাগত ও মতাদর্শিক উন্নয়নই পূনর্জাগরনের সঠিক ভিত্তি আর বস্তুগত উন্নয়ন হচ্ছে এর ফলাফল। আমরা যখন উম্মতের পূনর্জাগরনের কথা বলি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ পুনর্জাগরণ ইসলামী আকীদাহ ও তা থেকে বের হয়ে আসা ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ আমাদেরকে পৃথিবীতে এ আকীদাহ প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এ ব্যবস্থাটি রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে আরবী ভাষায়। অতীতে আরবরা পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতিতে পরিনত হয়েছিল কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল করেছিলেন। এবং এ ভাষাতেই তারা শরীয়াহ বুঝেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। এবং আরবী ভাষার কোনো কিছু সবচেয়ে ভালোভাবে আরবীতেই বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু ভাষার অর্থ ও আকুতি অনেকটাই অনুবাদে হারিয়ে যায়। অন্য যেকোনো ভাষার সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। উদাহরণসরূপ, আমরা শেক্সপিয়ারকে ইংরেজি, ইকবালকে উর্দু, নজরুলকে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতেই পূর্নাঙ্গরূপে বুঝতে পারবো না। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থার খুটিনাটি বিশ্লেষন বুঝতে হলে আরবী ভাষার জ্ঞানও থাকতে হবে।

আমরা যারা হুকুম শরঈ' নিয়ে পড়াশুনা করেছি তারা জানি যে, ফরয-এ-কিফায়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাধ্যতামূলক ফরয দায়িত্ব এবং ফরয হিসেবে ফরয-এ-আইন হতে কোনো অংশে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শুধুমাত্র পার্থক্য হল, ফরয-এ-কিফায়াকে পালন করার জন্য আল্লাহ পুরো উম্মতকে একসাথে দায়িত্ব দিয়েছেন, উম্মতের প্রত্যেকটি সদস্যকে আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু উম্মাহর মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমান সদস্য যদি সন্তোষজনকভাবে এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে কাজটি সম্পন্ন করাটা পূরো উম্মতের জন্য ফরজে আইন হিসেবে ঝুলে থাকে। আমরা জানি ইজতিহাদ করাটা ফরযে কিফায়া এবং ইজতিহাদ করার জন্য আরবী ভাষা জানাটাও আবশ্যক। এবং উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক যুগে অবশ্যই যথেষ্ঠ পরিমানে

মুজতাহিদ থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি আমরা সে পরিমান মুজতাহিদ ও সেরকম ইজতিহাদ চর্চা দেখতে পাবো ? এখন আমরা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পারবো যে বর্তমানে আরবী ভাষার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য কতটা জরুরী। এছাড়াও খিলাফত প্রতিষ্ঠার দা'য়ী হিসেবে উম্মতের কাছ থেকে আস্থা ও নেতৃত্ব অর্জন করার জন্য আরবী ভাষা জানাটা খুবই জরুরী।

উম্মাহর সমৃদ্ধির সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা। দুনিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত এ দ্বীন দিয়েই সমাজ পরিচালনা করতে হবে। আর এ কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে মুসলিম জাতিকে অসংখ্য নতুন সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতেও হতে হবে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ হচ্ছে সেই ইঞ্জিন যা ইসলামকে চালিত করে। এটি না থাকলে উম্মাহর মধ্যে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং উম্মাহর সমৃদ্ধি থমকে যাবে। এবং ঐতিহাসিকভাবেও এ বিষয়টির সত্যতা আমরা দেখেছি। শাইখ তাকী (রহ) বলেন,

"(মুসলিম উম্মাহ্র) এ অধ:পতনের পেছনে একমাত্র একটি কারণই ছিল, (মুসলিমদের) প্রচন্ড দূর্বলতা যা তাদের ইসলামকে বোঝার জন্য চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ দূর্বলতার পেছনের কারণ ছিল ৭ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম থেকে শুরু করে ইসলাম ও আরবী ভাষার বিচ্ছিন্নকরন যখন আরবী ভাষা ও ইসলামের প্রসার অবহেলিত হয়েছে। সুতরাং, যতক্ষন পর্যন্ত আরবী ভাষাকে ইসলামের সাথে এর এক অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবে মিশ্রিত না করা হবে, ততক্ষন পর্যন্ত এ অধ:পতন মুসলিমদের আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। এটা এ কারণে যে, এই ভাষার ভাষাগত ক্ষমতা ইসলামের শক্তিকে এমনভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে একে ছাড়া ইসলামকে বহন করা সম্ভব নয়, এবং যদি একে অবহেলা করা হয়, তবে শরীয়াহ্র মধ্যে ইজতিহাদ করা আর সম্ভবপর হবে না। (আর) আরবী ভাষার জ্ঞান ইজতিহাদের জন্য একটি মৌলিক শর্ত। এছাড়াও ইজতিহাদ উম্মতের জন্য অপরিহার্য যেহেতু এর সদ্ব্যবহার ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে উম্মাহর সমৃদ্ধির সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক কত গভীর।

আরবি ভাষা সঠিকভাবে শেখার কৌশল

আরবি ভাষা নানা শাস্ত্রে পরিপূর্ণ। কেউ যখন আরবি শিখতে শুরু করে তখন তাকে বুঝতে হবে যে, সে কার্যত তিনটি শাস্ত্র শিক্ষা করছে। এই শাস্ত্রগুলোর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা আরবি শিক্ষার্থীর ভাষা শেখাকে সহায়ক করে তোলে। এর মাধ্যমে সে জানতে পারে যে কোথায় ভাষাটির শুরু এবং কোথায় এর শেষ। দূর্ভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ আধুনিক আরবি বইগুলো এই তথ্যটুকু তুলে ধরতেও ব্যর্থ।

আসলে আরবি ভাষার শাস্ত্রগুলো সংখ্যায় মোট ১২টি। কিন্তু কুরআন এবং সুন্নাহকে উপলব্ধি করার জন্য ৩টি শাস্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলোঃ

এক. নাহু

এটিকে প্রায়সই 'ব্যাকরণ' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নাহু হলো ভাষা এবং বাক্যে শব্দ ব্যবহারের নিয়ম নিয়ে আলোচনা। উদাহরণস্বরূপ, আমি এখন তিনটি বাক্য উল্লেখ করবো এবং তাদের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরবো। সুতরাং মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন।

১.লা তাশরুবিল-লাবান ওয়া তা'কুলু আস-সামাক

২. লা তাশরুবিল-লাবান ওয়া তা'কুলিস-সামাক

৩.লা তাশরুবিল-লাবান ওয়া তা'কুলা আস-সামাক

এ তিনটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো, বাক্যের শেষে উল্লিখিত ক্রিয়াপদ "তা'কুল" এর মধ্যে যার অর্থ খাওয়া। প্রথম বাক্যে "তা'কুল" শেষ হয়েছে একটি দম্মাহ দ্বারা। দ্বিতীয় বাক্যে "তা'কুল" শেষ হয়েছে একটি সুকুন দ্বারা। কিন্তু তৃতীয় "তা'কুল" এর শেষ বর্ণ শেষ হয়েছে ফাতহাহ দ্বারা। এই ব্যতিক্রম ঘটেছে 'ওয়াও' এর বিভিন্ন প্রয়োগের কারণে। প্রথম বাক্যে 'ওয়াও' হলো সেই 'ওয়াও' যার দ্বারা ব্যবধান প্রকাশ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, "দুধ পান করোনা কিন্তু তোমার মাছ খাওয়ায় (কোনো সমস্যা নেই)"। দ্বিতীর বাক্যে 'ওয়াও' হলো সেই 'ওয়াও' যার দ্বারা যুক্ত করা বোঝায়। বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়, "দুধ পান করোনা কিংবা মাছ খেয়োনা"। তৃতীয় বাক্যে 'ওয়াও' দ্বারা ক্রিয়ার অভিন্নতা বোঝায়। এই বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়, "দুধ খেয়োনা এবং একই সাথে মাছও খেয়োনা"। অর্থের এই পরিবর্তন ঘটেছে 'ওয়াও' এর বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগের কারণে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র শব্দের হরকতের (স্বরবর্ণ) গঠনেই পরিবর্তন আনেনি, বরং বাক্যের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

দুই. সরফ

এটিকে প্রায়শই ভাষার রূপতত্ত্ব হিসেবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এর প্রকৃত অর্থ হলো, "ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণের ক্ষেত্রে আসল (ধাতু বা মূল) এর পরিবর্তনের মাধ্যমে এমন সব অর্থ বের করা যা অন্যথায় বের করা অসম্ভব ছিলো"। সরফ এর শাস্ত্র মূলত ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়াপদ থেকে

উদ্ভুত বিষয় সম্পর্কিত। এই পরিবর্তনটি মূলত অর্থের সম্প্রসারণ এবং মুখের উচ্চারণকে সহজ করার জন্য করা হয়ে থাকে। সরফ এর মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তনের বিষয়টির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে "নাসারা" শব্দটিকে পরিবর্তনের মাধ্যমে। "নাসারা" শব্দটি থেকে আমরা নিম্নোক্ত শব্দগুলো পেতে পারিঃ

নাসারা, নাস'সারা, নাআসারা, তানাসসারা, আনাসসারা, ইসতানসারা, মানসার, নাসির, মুনাসার, মানসুর ...

এই সবগুলো শব্দের ক্রিয়ামূল হলো নাসারা। কিভাবে একে মুখে উচ্চারণের ক্ষেত্রে সহজ করা যায় তার একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি। ধরুন আমরা 'স্কেল' শব্দটির আরবি বিবেচনা করছি। আরবিতে একে বলা হয় "মিযান"। শব্দটি ক্রিয়ামূল "ওয়াযানা" থেকে উদ্ভুত যার অর্থ পরিমাপ করা। সরফের নীতি অনুযায়ী যে জিনিসটির মাধ্যমে এই কাজটি করা হবে তার উচ্চারণ "মিফ'আল" এর মতো শোনাবে।

যদি এখানে এর (মিফ'আল) প্রয়োগ করি তাহলে পরিমাপের কাজটিকে বলা হবে "মিউযান"। উচ্চারণের জটিলতার দরুণ আমরা 'ওয়াও' কে 'ইয়া' দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেই যাতে সহজ করার খাতিরে। এই সহজ করার নীতিকেই 'সরফ' বলা হয়। সারফের সঠিক প্রয়োগ অনেক সময় ঈমান এবং কুফরির মাঝে পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, আল্লাহ নিজের সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে বলেন যে তিনি 'আল মুসাওয়ির' অর্থাৎ আকৃতি দানকারী। কেউ যদি এখানে 'ওয়াও' এর সাথে কাসরাহ এর পরিবর্তে ফাতহাহ মিলিয়ে উচ্চারণ করে তবে এর অর্থ দাঁড়ায় 'আল-মুসাওয়ার', অর্থাৎ যাকে আকৃতি প্রদান করা হয়েছে (অন্য কেউ আকৃতি দান করেছে)। একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে যদিও এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে, তথাপি এটি আরবিতে সরফের গুরুত্ব তুলে ধরে।

তিন. বালাগাহ

এটি এমন একটি শাস্ত্র যা আরবি ভাষার রূপ বা অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে। শব্দের অর্থ নিয়েও বালাগাহ আলোচনা করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কুরআনের ই'জায (আলৌকিক) প্রকৃতি বোঝার জন্য বালাগাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন থেকে বালাগাহ এর একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। মহান আল্লাহ তা'আলা সুরা আনকাবুত এ বলেন, "আলিফ-লাম-মিম। মানুষ কি মনে করে যে তাকে একথা বললেই ছাড় দেওয়া হবে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি" এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিলো, যাতে আল্লাহ এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে পারেন যে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যুক।" কুরআনের এই মহান আয়াতে পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, "যাতে আল্লাহ এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে পারেন যে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যুক।" আয়াতের এই অংশটিতে আল্লাহ তা'আলা অতীতকাল

হিসেবে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন 'সাদাকু'। এটি দ্বারা এ বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা আগে থেকেই সত্যবাদী ছিল এবং এই পরীক্ষাগুলো শুধুমাত্র তারই সাক্ষ্যীস্বরূপ যা(তাদের মাঝে) পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলো অর্থাৎ সত্যবাদীতা। এরপর আল্লাহ বলেন, "এবং একথা সুস্পষ্ট করা যে, কারা মিথ্যুক।" এই অংশে আল্লাহ তাদের বিষয়ে আলোচলা করেন যা মিথ্যুক হওয়ার দরূণ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এখানে তিনি 'কাযিবিন' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। বালাগাহ এর শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, এই বর্ণনামূলক শব্দ বা সিফাতটি এই গুণের অধিকারী ব্যক্তির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা প্রকাশ করে। আল্লাহ ইহুদিদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং কিভাবে তারা নবীদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাদের কতককে তারা হত্যাও করেছে। সুরা বাকারায় এটিকে অতীতকাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যখন আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমরা বালাগাহ এর বিশেষ নিয়ম দেখতে পাই যা ইংরেজি অনুবাদের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, "ফা ফারিকান কাযযাবতুম ওয়া ফারিকান তাকতুলুন": "তাদের কতককে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে এবং কতককে হত্যা করেছিলে"। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা নবীদের একটি দলকে অস্বীকার করেছিলো। তিনি এখানে অতীতকাল হিসেবে 'কাযযাবতুম' শব্দটি ব্যবহার করছেন। কিন্তু আয়াতের শেষে আমরা দেখতে পাই যে, যখন তিনি (আল্লাহ) বলেন, তারা (ইহুদিরা) তাদের (নবীদের) কতককে হত্যা করেছে, তিনি (আল্লাহ) বর্তমান কাল হিসেবে 'তাকতুলুন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বালাগাহ এর শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, যদি অতীতকালের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে এটি "ইসতিমরার" বা ধারাবাহিকতা বোঝায়। সুতরাং বালাগাহ এর প্রেক্ষাপটে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইহুদিরা (পূর্বে)নবীদেরকে অস্বীকার ও হত্যা করতো এবং তারা ধারাবাহিকভাবে নবীদের সত্য পথের অনুসারীদেরকে হত্যা করতে থাকবে। এটি তাফসিরে আল্লুসি এবং তাফসির ইবনে সাউদে উল্লেখ রয়েছে।

আরবি শেখা – কোথা থেকে শুরু করবো?

এটি আপনার নিজের ওপরে নির্ভর করে। আপনি আপনার আরবি ভাষার জ্ঞান দিয়ে কি করতে চান? একজন বক্সার তার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। একজন দৌড়বিদ দৌড় প্রতিযোগীতায় জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। একজন দৌড়বিদ যদি একজন বক্সারের মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে সে দৌড় প্রতিযোগীতায় জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেনা। একইভাবে, একজন বক্সার যদি একজন দৌড়বিদের মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাহলে সে তার লড়াইয়ে জেতার মতো শক্তিবল পাবেনা। নিম্নে চিন্তা-ভাবনা করার মতো কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলোঃ

১। আপনাকে আরবি দিয়েই আরবি বুঝতে হবে।

২। নিজে একজন ভাষা অনুবাদকারী হওয়া এর উদ্দেশ্য নয়।

৩। এমন কোনো “একটি বই” নেই যা আপনাকে আরবির সব বিষয় শেখাবে।

৪। বিগত ১৪০০ বছর ধরে আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অনারবরা আরবি ভাষা শিখে আসছে। সুতরাং এটি ধারণা করা ভুল যে, আমরা শিখতে পারবোনা যেমনিভাবে তারা পূর্বে শিখে এসেছে।

৫। আরবি শেখার প্রচলিত পদ্ধতিগুলো পরীক্ষিত এবং সত্য। সুতরাং, নতুন কোনো পদ্ধতিতে ভাষাটি শেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

৬। আপনি কেবলমাত্র একটি দিক শিখেই আরবি শিখতে পারবেননা। শুধুমাত্র ব্যকরণ শিখলেই আপনি আরবি শিখতে পারবেননা। আর যদি আপনি শুধু শব্দভান্ডার শিখতে থাকেন, তাহলেও আপনি প্রকৃতপক্ষে আরবি শিখতে পারবেননা। আপনাকে পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে।

৭। আপনাকে যথাসম্ভব পড়তে হবে। আরবির অন্যান্য বিষয়ে ছোট ছোট বই পড়তে শুরু করুন। একটি নোটপ্যাডে নতুন নতুন শব্দগুলো লিখে রাখুন। যখনই আপনি অভিধানে কোনো শব্দ খুজেন, তখন পেন্সিল দিয়ে তার নিচে দাগ দিয়ে রাখুন। আপনি যদি পরবর্তীতে শব্দটি আবার খুঁজেন এবং তার নিচে পেন্সিলের দাগ দেওয়া দেখতে পান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেই শব্দটি মুখস্ত করতে হবে। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, আপনি আবারো সেই শব্দটি দেখবেন। শব্দগুলোর ইংরেজি অর্থগুলো যে বইটি আপনি পড়ছেন সেখানে লিখে রাখবেন না। কারণ এভাবে আপনি শুধু ইংরেজি অর্থগুলোই পড়বেন প্রকৃত আরবি শব্দগুলো বাদ দিয়ে।

৮। আপনাকে শুনে শুনে শিখতে হবে। এভাবে আপনি জানতে পারবেন যে কিভাবে আরবি বলা হয়ে থাকে এবং নানা চিন্তা-ধারণা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি শুনে শুনে এমনভাবে কাজ করেন যেন আপনি যা শুনছেন তার সবকিছুই বুঝতে পারছেন। যদি আপনি কোনো বক্তা খুজে না পান, তাহলে কিছু আলেম ও শিক্ষার্থীদের ক্যাসেট কিনতে পারেন। কিছু সুস্পষ্ট বক্তা হলেন, শায়খ মুহাম্মাদ আল উসাইমিন, শায়খ আল আলবানি, শায়খ মুহাম্মাদ আল মুখতার আশ শিনকিতি এবং শায়খ সালিহ আল আশ শায়খ। যাদের বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট নয় তাদেরও বক্তব্য শোনা উচিত। এর মাধ্যমে শ্রবণ দক্ষতায় পাণ্ডিত্য অর্জিত হবে। এরকম কিছু বক্তা হলেন, শায়খ আব্দুল আযিয ইবনে বায, শায়খ জিবরিন ও শায়খ ওয়াইজ আল কারনি।

৯। কুরআন শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন।

১০। আরবি দিয়েই আরবি ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন। তাদের মতো হবেননা যারা সবকিছু নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে চায়। এটি কিছুটা সময় নিবে, কিন্তু আরবি ভাষা যেমন সেটিকে তেমনিভাবে বোঝার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১১। সেসব আরবদের সাথে যত বেশি সম্ভব কথা বলুন যারা আপনার ভুল শুধরিয়ে দিবে এবং শিখতে সহায়তা করবে।
১২। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সবসময় পড়তে থাকা। আপনি যদি না পড়েন তাহলে কখনোই ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারবেননা। আপনাকে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়তে হবে। পড়া আপনাকে দ্বীনের বিভিন্ন শাস্ত্রের আভাস দিবে এবং আপনার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে।
১৩। প্রাথমিকভাবে আপনার মূল লক্ষ্য রাখুন বোঝার দিকে। আমাদের অনেকেই নিজের ধারণার চেয়ে বেশি শব্দ জানি যা আরবদের সাথে আলাপচারিতা ক্ষেত্রে ব্যবহারের চিন্তাও করিনা। ইংরেজির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারেন।

আরবি কাব্যসাহিত্যে ইসলামের প্রভাব

ইসলাম নিছক একটি ধর্মই নয়, বরং ইসলামের আবির্ভাব যুগপৎভাবে একটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে সমকালীন সাহিত্যেও। সুতরাং বিষয়গতভাবে জাহিলি সাহিত্যের সঙ্গে এর আমূল পার্থক্য সূচিত হয়। জাহিলি কাব্যে যেখানে গোত্রীয় অহমিকা, বংশগৌরব, বেপরোয়া জীবন ও প্রতিশোধস্পৃহার বর্ণনা রয়েছে, সেখানে ইসলামী যুগের সাহিত্যে মহান আল্লাহ, তাওহিদ, রিসালাত ও জিহাদের প্রসঙ্গ স্থান করে নিয়েছে।
ইসলাম এসে গোত্রীয় আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনে খোদাভীতিকেই মর্যাদার মানদণ্ড নিরূপণ করে। বিদায় হজের ভাষণে নবীজি (সা.) দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, পিতৃপুরুষ নিয়ে জাহিলি ধারার গৌরব ও অহংকার মহান আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তিরোহিত করেছেন। তোমরা সবাই আদম সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।
তাকওয়া ছাড়া আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।
ইসলামের আবির্ভাবে গোত্রীয় ও স্বাজাত্যবোধের চেতনা ধুলায় মিশে যায়। কুলজিবন্ধন ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বের স্থলে ধর্মীয় বন্ধন ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর আদর্শিক এই পরিবর্তনের হাওয়া আবরদের চিন্তা ও মনন সাহিত্য মানসেও দোলা দেয়।
ফলে এত দিন যে কবি বংশগৌরব ও নিন্দাকাব্য রচনায় মগ্ন ছিলেন, যে বাগ্মী স্বীয় রসনা দিয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন ছড়াতেন এবং যে অশ্বারোহী বীর দিবারাত্রি রক্তের হোলিখেলা ও শৌর্যবীর্য প্রকাশে মত্ত ছিলেন তাঁরা সবাই ইসলামের দাওয়াতে নীরব ও স্থবির হয়ে পড়লেন। তাঁরা যেকোনো কথা ও কাজে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুল (সা.)-এর অনুমোদনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ থাকতেন। ফলে এক পর্যায়ে সাহিত্যের পরিধি ও এর চর্চা অনেকটা সীমিত হয়ে আসে।

মক্কার অবিশ্বাসী কবিরা মুহাম্মদ (সা.), ইসলাম ও মুসলমানদের বিষোদগার করে কাব্য রচনা করেন।

পরবর্তী সময়ে ইসলামের বৈপ্লবিক জাগরণের ফলে মদিনায় আনসারদের একদল কবি তাঁদের কটূক্তির জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে যান।

ইসলামের মানমর্যাদা ও মাহাত্ম্য সমুন্নত রাখতে রাসুল (সা.) তাঁদের কাব্য রচনায় নানাভাবে উৎসাহিত করেন। এসব কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাসসান ইবনে ছাবিত (রা.), কাব ইবনে মালিক (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) প্রমুখ। পরে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মুসলমান কবিদের কাব্যে ইসলামের অনুশাসন, পবিত্র কোরআন ও হাদিসের প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ব্যাপকহারে দেদীপ্যমান হতে থাকে।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের কাব্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, (ক) কবিতায় ইসলামের মূলনীতিবিরোধী বিষয়বস্তু পরিহার। (খ) কবিতায় শরিয়ত লক্ষ্যমুখী বিষয়ের আমদানি। (গ) নবধর্ম ইসলামের বিজয়সূচক গাথা রচনা। (ঘ) কবিতায় পবিত্র কোরআনের শব্দগত, অর্থগত ও শৈলীগত প্রভাব। (ঙ) রাসুল (সা.)-এর প্রশংসা ও ইসলামের শত্রুদের নিন্দায় কাব্য রচনার সূচনা।

জ্ঞান চর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন। বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, ''আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায়

পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।"

অপর একজন আয়েশা যিনি সা'দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন। মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরাণ্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, করীমা বিনতে আল্-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেছেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাও অন্তর্ভুক্ত।

ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সাথে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শরীফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, খাওলা বিনতে তাওরীত রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে লোক আসতো।"

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী

সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।

আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما.

“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।”

আরবি ভাষা কম্পিউটারের সফটওয়্যারে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন যিনি

শায়খ আল-শারিখ ছিলেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের অন্যতম, যিনি আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যকরণ থেকে সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তা ছাড়া আশির দশকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কম্পিউটারে আরবি ভাষা চালুর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ২০১৮ সালে তিনি কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পুরস্কার এবং ২০২১ সালে ইসলামের সেবার জন্য সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন।'

আল-শারিখ ১৯৪২ সালে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৬৫ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের উইলিয়ামস কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কুয়েত উন্নয়ন তহবিলের সহকারী পরিচালক এবং বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। কুয়েত ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদের প্রধান ছিলেন।

আধুনিক প্রযুক্তিতে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি আনতে আল-শারিখ সাখর প্রজেক্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে স্ক্রিন রিডার, মেশিন ট্রান্সলেশন, অটোমেটিক স্পিসসহ আরবি ভাষার উন্নয়নে নানামুখী কাজ করা হয়। এখান থেকে তরুণদের কম্পিউটার প্রগ্রাম ও বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক বই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পবিত্র কোরআন, ৯টি প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ ও ইসলাম বিষয়ক তথ্যাবলি কম্পিউটার প্রগ্রামে ডেভেলপ করে।

তিনি ১৯৮২ সাল থেকে কম্পিটার প্রগ্রাম আরবিকরণ, অ্যারাবিক ইলেকট্রনিক ডিকশেনারি, প্রুফ রিডার প্রগ্রাম, অটোমেটিক ফর্মাল অ্যারাবিক প্রনানসিয়েশন, মেশিন ট্রান্সলেশন ডেভেলপ করাসহ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ভিশন সিস্টেম উন্নয়নে কাজ করেন।

সূত্র : আলজাজিরা

আরবি ভাষা সংরক্ষণ

সাধারণত ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটে। শেক্সপিয়রের রচনা শৈলীর ইংরেজী এবং আধুনিক ইংরেজীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার দিকে শুধু দৃষ্টিপাত করুন। বিভিন্নভাবেই এই দু'টা আলাদা ভাষা বলে মনে হবে এবং শেক্সপিয়রের যুগের ইংল্যান্ডের একজন মানুষ ও আধুনিক যুগের একজন মানুষ একে অপরের সাথে আলাপ করতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। কিন্তু এই আরবী ভাষা শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়। এই কারণে ছাহাবীগণ ও প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ক্লাসিক আরবী ভাষাকে সংরক্ষণ করার জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করেছিলেন। আলী (রাঃ) আরবদের প্রাদেশিক ভাষায় সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন এবং আরবী ব্যাকরণ বিধিকে সার্বজনীন কাঠামোতে লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, আরবী ভাষার সংরক্ষণ হ'ল স্বয়ং ইসলামকে সংরক্ষণেরই অংশ।

আরবী ভাষা মুসলিম দেশগুলোর মধ্য সমন্বয় সাধন করেছিল। কারণ যারা সাদরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের দেশে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য দেখা যায় যে, যে মুসলিম সমাজগুলো আরবীতে অজ্ঞ তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কম। এই অজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে অধিক বিপথগামী করেছে।

ইসলামের শত্রুরা এটা জেনে মুসলমানদের আরবী ভাষা ও কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। আলজেরিয়া যখন ফ্রান্সের অধীনে ছিল তখন ফ্রান্সের সরকারকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, 'আমরা ততদিন পর্যন্ত আলজেরিয়া বশীভূত করতে পারব না যতদিন পর্যন্ত তারা কুরআন পাঠ করবে এবং আরবী ভাষায় কথা বলবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে আরবী কুরআন সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের মুখ থেকে আরবী ভাষা কেড়ে নিতে হবে'।

তুর্কীর ধর্মনিরপেক্ষ নেতা কামাল আতাতুর্ক, যিনি ইসলামী খিলাফতের বিলুপ্তি সাধন করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতই এটা করেছিলেন। তিনি আদেশ করেছিলেন যে, কুরআন তুর্কী ভাষায় পাঠ করতে হবে, এমনকি ছালাতেও। আর যেসব তুর্কী ভাষা আরবীতে লিখা হ'ত, তা ল্যাটিন ভাষায় পরিবর্তন করেছিলেন।

যদিও আরবে দুর্ভাগ্যক্রমে সারা বিশ্বের ন্যায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ক্লাসিক আরবী শিক্ষা দেয় এবং প্রতিটি সংবাদপত্র ও বইয়ের লিখার মানদন্ড হ'ল ক্লাসিক আরবী। তাই এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে। যেমনভাবে তিনি কুরআনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি, আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

আমাদের সকলের জন্য একটি পূর্ববর্তিতা

বিদ্বানগণ আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য উম্মাহকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ مَا بَلَغَهُ جُهْدُهُ فِي أَدَاءِ فَرْضِهِ كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالْأَذْكَارَ

'সালাত ও দো'আ-দরূদসমূহ শেখার ন্যায় প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সাধ্যনুযায়ী আরবী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, যাতে সে ফরয সমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারে' *(মাওয়ার্দী, আল-হাবী ফী ফিকহিশ শাফেঈ ১৬/১২০)*।

৮ম শতাব্দীর বিখ্যাত পন্ডিত শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলতে গিয়ে এতটাই বলেছেন যে, نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب 'আরবী ভাষা স্বয়ং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা শেখা অতীব যরূরী' *(ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম, পৃঃ ২০৭)*।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শুধুমাত্র অনুবাদের উপর নির্ভর করে স্বস্তিবোধ করছি এবং আমাদের সব সময় ও প্রচেষ্টা অন্যান্য জিনিস (এমনকি অন্যান্য ভাষা) শেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করছি, যা পরকালে আমাদের কোন উপকারে আসবে না। কুরআনের ভাষা যে খুবই সুগম এবং এটা পড়া ও বুঝা যে আমাদের সকলের কর্তব্য অথবা দায়িত্ব তা ভুলে গেছি।

যদি আপনি জানতেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি এসেছিল, তাহ'লে আপনি কি এটা প্রকৃত রূপে বুঝতে চাইতেন না? এ ব্যাপারে ভেবে দেখুন। আমাদের কাছে মানবজাতির শেষ প্রত্যাদেশ রয়েছে, আমাদের রব ও মালিকের পক্ষ থেকে একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম, যা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সত্তরোর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমরা এটার উপর যথাসাধ্য মনোযোগ দেই না। আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে উন্নত ভাষা নির্বাচন করেছেন। আর আরবী ভাষায় মনোযোগ দেওয়া হ'ল আল্লাহর কিতাবে মনোযোগ দেওয়া। তাই অগ্রাধিকার দিয়ে এটা শিক্ষা করা উচিত।

আমি স্মরণ করি সে সময়ে কথা, যখন আমি প্রথম আরবী ভাষা শেখার কাজে নিযুক্ত হই, তখন সালাতে আল্লাহর বাণীর মিষ্টতার যে স্বাদ তা অনুভব করি। আমি শুধু কুরআনের একই আয়াত বার বার পড়ছিলাম এবং শব্দের স্বাদ নিচ্ছিলাম এবং হৃদয়ে এক গভীর আবেগ অনুভব করছিলাম, যা ইতিপূর্বে আমি কখনও অনুভব করিনি। যদিও একই আয়াত আরবী শেখার আগে বহুবার পড়েছি। তখন এমন মনে হয়েছিল যে, এটা আমার জন্য একটি দ্বীপ জ্বালিয়ে দিল এবং হঠাৎ করে আমি ঘরের একটি নতুন অংশ আবিষ্কার করলাম। যে ঘরটাতে আমি বছরের পর বছর

ধরে বসবাস করেছি। আরবী শেখার একটি নির্দিষ্ট উপকারিতা হ'ল এটা সালাতে খুশূ বা আত্মজ্ঞানে সাহায্য করে এবং আমাদের সকল ধর্মীয় কর্মকান্ডকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

আরবি শেখার ক্ষেত্রে কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ

সকল শিক্ষামূলক সহায়ক বস্তু এবং তথ্যের সহজদ্বার যা আমাদের আছে, আরবী ভাষা শিক্ষা বলতে অপরিহার্যভাবে দূরবর্তী দেশে দুষ্কর অভিযানে যাওয়াকে বুঝায় না, যেমনটি একসময় বুঝানো হ'ত। নিয়মানুবর্তিতা এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার নিজস্ব সময়ে অধ্যয়ন করতে পারে। এখানে কিছু টিপস দেওয়া হ'ল যা আপনাকে সাহায্য করবে।

১. দো'আ করুন : সবকিছু নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ এগিয়ে নিতে চাচ্ছি, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করা উচিত, যাতে আমাদের শিক্ষা সহজ হয়। আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করা উচিত, যাতে সত্যিই কুরআন ও দ্বীন অধিকতর ভালভাবে বুঝার জন্য আরবী শিখতে পারি।

২. নিয়মানুবর্তী হোন : প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার আরবী শেখার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখুন এবং এটার সাথে লেগে থাকুন। মনে রাখবেন, এক মাসে একবার ঘণ্টাখানে পড়ার চেয়ে প্রতিদিন অল্প পড়া অধিক ভালো।

৩. আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে ভালভাবে জানুন : যে কোন ভাষায় দক্ষ হ'তে হ'লে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাওয়া হ'ল সবচেয়ে ভাল উপায়। পড়া ও শেখার মূল পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা আরবী শেখার প্রথম ধাপ, যদিও এটা পুনরাবৃত্তিমূলক হয়। এরপর আপনি সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করতে পারবেন।

৪. ভাল অভিধান ও আরবী বইয়ের জন্য বিনিয়োগ করুন : হ্যান্স ওয়ের বা আল-মাওরিদ একটি অভিধান, যা অধিকাংশ মুসলিম দোকানগুলোতে, এমনকি ইন্টারনেটেও সহজলভ্য। আরবী শব্দ সাধারণত তিনটি বর্ণমূলের অধীনে বিন্যস্ত। প্রায়ই শব্দ খুঁজে বের করুন এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিধান রচনা করুন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বই অথবা 'কিতাবুল আসাসী' বইয়ের মাধ্যমে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন।

৫. একটি গ্রীষ্মকালীন কোর্সে নিবন্ধন করুন : প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে কিছু কোর্স রয়েছে, এগুলো আপনার পড়াশোনার ব্যাপারে বিশাল সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এগুলো বেশ প্রগাঢ় হ'তে পারে। তাই বার বার পাঠ করতে থাকুন ও স্মরণ করুন এবং আপনার পড়াশোনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান।

৬. আপনার পূর্ণ মেয়াদী ডিগ্রী হিসাবে আরবী অধ্যয়ন করুন : যদি আপনি একটি ডিগ্রী নিতে চান, তাহ'লে আরবীতে ডিগ্রী অথবা ডিগ্রীর অংশ হিসাবে আরবী ভাষা নেওয়া, কেন নয়?

৭. আরবের কোন বন্ধু বা শিক্ষকের অধীনে পড়ুন : একজন ভাল শিক্ষকের গুরুত্ব যে কতটা তা জোর না দিয়ে বলা যায় না। যদিও নিজের প্রচুর পড়াশোনা এর সাথে জড়িত। একজন আরবী জানা বন্ধু অথবা আরবের একজন ভাই বা বোনের কাছে প্রতিদিনের দিকনির্দেশনার জন্য যেতে পারেন, তা খুবই মূল্যবান হবে। এমনকি আপনি আপনার আরবী বইগুলো নিয়েও তাদের কাছে যাওয়া শুরু করতে পারবেন।

৮. স্থানীয়ভাবে একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করুন : আপনার এলাকার আরবী শিখতে আগ্রহী মুসলিম ভাইয়েরা একত্রিত হ'তে পারেন এবং স্থানীয় মসজিদ বা আপনাদের কারো বাড়িতে আরবী শিখানোর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করুন। বন্ধুদের সাথে পড়াশোনা করা অনুপ্রাণিত থাকার একটি ভাল উপায়।

৯. কোন একটি আরবী দেশে অধ্যয়ন করুন : আরব দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ভাল কোর্স পরিচালিত হচ্ছে, যেমন মিসরে। যা সত্যিকারার্থে আপনার শিক্ষার গতি বাড়াবে এবং আপনাকে একটি খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা উপহার দিবে। লোকজন দেখেছে যে, বাড়িতে এক বছর বা তার চাইতে অধিক সময় পড়ার চাইতে আরবের একটি দেশে কয়েক মাস পড়াশোনা করা অধিক ফলপ্রসু হ'তে পারে। আপনি যখন দেশে ফিরে আসবেন, তখনও পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন।

১০. যতটা সম্ভব নিজে নিজে আরবী প্রকাশ করুন : আপনি আরবী লেকচার টেপগুলো শুনতে পারেন, মুসলিম দেশগুলোতে ভ্রমণ করতে পারেন। প্রতিদিন কিছু আরবী পড়তে পারেন এবং যখন আপনি আরো দক্ষ হবেন তখন একটি আরবী সংবাদপত্র রাখতে পারেন।

১১. যখনি পারবেন আরবীতে কথা বলুন : বাক্য ভুল করার লজ্জা আরবীতে কথা বলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর মধ্যে একটি এবং তাতে আদৌ কথা বলা যায় না। আপনাকে অবশ্যই তা কাটিয়ে উঠতে হবে। আর যখনি পারবেন, তখন আপনি যা জানেন তা ব্যবহার করুন। এভাবেই আপনি উৎকর্ষ সাধন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি আরবের কিছু ভাই বা বোনদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, যারা শুধু আরবীতে কথা বলে। এই প্রক্রিয়ায় আপনি যা জানেন তা বলতে বাধ্য হবেন এবং তারা খুশি হবে যে, আপনি চেষ্টা করছেন।

১২. আপনার জ্ঞানকে কুরআন এবং অন্যান্য ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করুন : ভুলে যাবেন না যে, আপনার উদ্দেশ্য হ'ল কুরআনের যা পাঠ করেন, বিশেষ করে ছালাতে এবং অন্যান্য যিকির-আযকারে তা বুঝা। আরবী শব্দ চিনতে চেষ্টা করুন, যখন তা কুরআনে পাবেন। কুরআন বুঝতে আপনার জ্ঞান প্রয়োগ করুন। গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং ছালাতে শব্দের উপর মনোযোগ দিন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনের ভাষায় দক্ষ হ'তে এবং এটা সমগ্র উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন- আমিন!

সংকট ও আগ্রাসন

বিশ্বায়নের দাপুটে প্রভাবে সব দেশই তাদের মাতৃভাষা নিয়ে চিন্তিত। বিশ্বের সংযোগ-ভাষা হয়ে ওঠায় ইংরেজির দাপট বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আরবি ভাষাও এ সংকট মুক্ত নয়। আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

অনেক অফিসের কাজের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে ইংরেজিতে। মিডিয়ায়, নাটকে, অনুষ্ঠানাদিতে চলছে ইংরেজি ও বিদেশি ভাষার আধিক্য। মিডিয়াকর্মী, গবেষক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষায় আজ ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি। তরুণ-তরুণীদের মাঝে ইংরেজিপ্রীতি বাড়ছে ভয়ানকভাবে।

তাদের কথায়, আচরণে বিদেশি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরবি ভাষা তাদের কাছে অবহেলিত। আরবির অশুদ্ধ বানান, অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, অশুদ্ধ বাক্যগঠন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। দোকান, রেস্তোরাঁর বিলবোর্ডে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আরবি হরফে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য অথবা সরাসরি ইংরেজি নামের ব্যবহার।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আজ বিশুদ্ধ আরবির পরিবর্তে আঞ্চলিক এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। আরবি ভাষা পরিস্থিতি এখন চরম নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তিকর অবস্থার শিকার। বিদেশি ভাষার আগ্রাসন মূলত আরব জাতির জন্য এক বিরাট ভাষিক সংকট।

সমাধান ও উত্তরণ

আরবি ভাষার মতো এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত ভাষার এ সংকট মোকাবিলায় সবাইকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। আরবির ক্ষেত্রে এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আরব দেশগুলোকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংকট এবং ভাষাগত নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে আরব বিশ্বের ভাষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সচেতনতা, উপযুক্ত কর্মপ্রয়াস জোরদারের বিকল্প নেই।

বাস্তবতা ও নিরসন

আরবি ভাষা ব্যবহারে বা শেখায় অনেকেরই হীনমন্যতা কাজ। মূলত সবার হৃদয় থেকে এটা ত্যাগ করতে হবে। আরবি ভাষা এবং আরব জাতির আত্মপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে আরবি ভাষা শেখায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মিডিয়া, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে বিশুদ্ধ আরবি ব্যবহার করতে হবে।
কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যেই ভাষা অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তার শুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হবে। আরব দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরবির প্রচার প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। যত্নের সঙ্গে আরবি শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। এ ভাষাকে চির সজীব রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এ ভাষা আরব জাতি ও মুসলিমদের শুধু প্রিয় ভাষা নয়; বরং তাদের আত্মপরিচয়।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়

আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিগত শতাব্দীর নববইয়ের দশক পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আরবী বিভাগ এবং কওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচীর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং এর জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী, প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গড়ে উঠে। এর জন্য এক বছর বা দু'বছর মেয়াদি কোর্সও চালু করা হয়। এসব কোর্সে

সাধারণত কওমী মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ও সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভর্তি হয় এবং নতুন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে তারা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং বলার ও লেখার যোগ্যতাও কমবেশী লাভ করতে সক্ষম হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করার পরও ছাত্ররা কেন নতুন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি হয় এবং কমপক্ষে এক-দুই বছর ব্যয় করে? এর সহজ উত্তর হল, আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর আরবী পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পান্ডিত্য অর্জন নয় বরং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

১. বিশুদ্ধভাবে আরবী ইবারত পাঠ করার দক্ষতা অর্জন।

২.আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে এর মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জন।

৩.পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ।

তবে এটা অনস্বীকার্য যে, কওমী মাদরাসার আরবী পাঠ্যক্রমেও এমন মৌলিক উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হতে পারে। বাসত্মবেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে, ভাষা চর্চা ও সাহিত্য চর্চা কি একই বিষয়? নিরেট সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কি ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব? এর পরিষ্কার ও যথার্থ উত্তর হল, না। কারণ, যে কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য ও পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত এবং ব্যবহারিক জীবনের ভাষিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। এই বাস্তবতা কেবল আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয়। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আরবী সাহিত্যের প্রাচীন পদ্য 'আস সাবউল মু'আল্লাকাত', 'দিওয়ানুল হামাসা', 'দিওয়ানুল মুতানাববী' এবং প্রাচীন গদ্য বিশেষ করে 'মাকামাতে হারিরী' ইত্যাদি প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-গ্রন্থাদি পাঠ করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। আর এ কারণেই ছাত্ররা এসব গ্রন্থাদি পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য নতুন করে ভাষাচর্চা করতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও আরবী সাহিত্যের ছাত্ররা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেও ঐ একই কারণে নতুন করে ভাষা কোর্সে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

আদব বা সাহিত্য শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার এবং অনেকটা অপপ্রয়োগের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। বিষয়টি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, নিছক নাহু-সরফের স্বল্প মেয়াদি কোর্সের নামও দেয়া হয়

“আরবী আদবের কোর্স”। আবার কোথাও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মানের আরবী গদ্য ও পদ্যের কোর্সকেও “আরবী সাহিত্যের কোর্স” বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটাকে “যুল্ম” বললে অযৌক্তিক হবে না। কারণ যুল্ম শব্দের অর্থই হচ্ছে وضع شيء في غير محله غير محله (কোনো কিছুর অপপ্রয়োগ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এই স্বল্প মেয়াদি ভাষা কোর্সের নাম দেয়া হয় (تخصص تخصص في الأدب) অর্থাৎ সাহিত্যের অনার্স কোর্স। অথচ অনার্স কোর্স বা বিশেষায়িত কোর্সের জন্য অন্তত পক্ষে চার বছরের প্রয়োজন। অপরদিকে যারা এই কোর্সে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের অনেকেরই নামের আগে الأديب الأريب"" (সুসাহিত্যিক) শব্দটি যোগ করা হয়। কাজেই আদব শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ও এর মূল উপাদান কী সে ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবস্থান যথার্থরূপে ও বাস্তবতার ভিত্তিতে নিরূপণ করতে সক্ষম হব।

বলা বাহুল্য যে, আরবীতে ‘আদব’ শব্দের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। এখানে আমরা কেবল তিনটি সংজ্ঞা তুলে ধরতে চাই। এর দুটো হল সাধারণ সংজ্ঞা, আর অপরটি হল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক সংজ্ঞা। আদবের দুটো সাধারণ সংজ্ঞ নিম্নরূপ:

الأدب هو الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين سواء أكان شعرا أم نثرا (د. شوقي ضيف/ تاريخ الأدب العربي)

অর্থ : সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল বক্তব্য -সেটা কাব্য হোক অথবা গদ্য- যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের আবেগকে প্রভাবিত করা।

الأدب إنما هو ألفاظ مختارة وتراكيب متقنة وأساليب مجودة, معان مؤثرة. (د. عبد العزيز بن محمد الفيصل / الأدب العربي وتاريخه(

অর্থ: সুচয়িত শব্দাবলী, বলিষ্ঠ গঠনরীতি, সুষমামন্ডিত রচনাশৈলী এবং হৃদয়গ্রাহী অর্থমালাই হচ্ছে সাহিত্য।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক আদব বা সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে নিমণরূপ:

كل شعر أو نثر يؤثر في النفس، ويهذب الخلق، ويدعو إلى الفضيلة، ويبعد عن الرذيلة بأسلوب جميل (د. عبد العزيز بن محمد الفيصل / الأدب العربي وتاريخه)

অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে এমন প্রতিটি কাব্য বা গদ্য যা নান্দনিক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে, চরিত্রকে পরিশীলিত করে, শালীনতার প্রতি আহবান করে এবং অশালীনতা হতে দূরে রাখে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহিত্য কেবল ব্যাকরণের কিছু নিয়ম কানুন ও হাজার খানেক শব্দ মুখস্থ করার নাম নয় এবং দুর্লভ বর্ণনাভঙ্গি ও কিছু দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে দু’একটা রচনা লেখাও সাহিত্য চর্চা নয়। সাথে সাথে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লেখক মাত্রই সাহিত্যিক নয়। বরং সাহিত্যিক হতে হলে আরও অনেক ভাষিক গুণ ও প্রতিভার

অধিকারী হতে হয়। যে কোনো ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো অপরিহার্য তা হচ্ছে:

১. শব্দমালা (المفردات)

২. ব্যাকরণ (النحو والصرف)

৩. শব্দতত্ত্ব (علم المعاني)

৪. বর্ণনা বিদ্যা (علم البيان)

৫. শব্দালঙ্কার (علم البديع)

৬. ছন্দশাস্ত্র (علم العروض)

৭. কল্পনা (الخيال)

৮. আবেগ (العاطفة)

এই বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে, আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদি যে কোর্সগুলোর আয়োজন করা হয়, তা আদৌ সাহিত্যে (متخصص) বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোর্স নয়। বরং তা হচ্ছে প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার কোর্স। এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্ররা আরবী ভাষায় বলা, লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের একটা কার্যকর সুযোগ পায়। এই মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে পড়া ও বলার যোগ্যতা যথাযথ ও কাঙ্ক্ষিত মানে অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে যত্নবান হতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (صحة النطق)

২. শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা (صحة الضبط)

৩. এ'রাবের বিশুদ্ধতা (صحة الإعراب)

৪. বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা (صحة الأداء)

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে সাধারণ লিখিত আরবী ভাষায় যেহেতু স্বরচিহ্ন বা ধ্বনিচিহ্ন (حركات) থাকে না, সাথে সাথে আরবী ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যার একাধিক কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে লেখা হয় তাই সেগুলো পড়ার সময় বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ করতে হয়। এ জন্য আরবী শব্দের একাধিক কাঠামো ও কাঠামোভেদে অর্থের পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানতে হয়। এর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম করতে হয় এবং ব্যাপক অনুশীলন করতে হয়। তাই কোনো ছাত্র যদি স্বরচিহ্ন বিহীন কোনো আরবী লেখা বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ এ'রাব ও সঠিক শব্দ কাঠামো রক্ষা করে পড়তে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে আরবী ভাষা শিক্ষায়

গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছে। কাজেই এ বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরকেও সজাগ থাকতে হবে এবং তাঁদের মাঝেও এ গুণ পরিপূর্ণরূপে না হলেও যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পর্যায়ের হতে হবে।

আরবী শিক্ষার্থীকে লিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্যই আরবী ভাষায় তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। বানানের নিয়ম-কানূন শিখতে হবে। ব্যাকরণসম্মত ও অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন পদ্ধতি জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী একক বিষয়ভিত্তিক পরস্পর যুক্ত ও সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের অনুশীলন করতে হবে। প্রাথমিক সন্তরে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ও সরল বাক্য গঠনের অনুশীলন করানো হবে। পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন আকার আকৃতির সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য গঠনের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। সাথে সাথে একই বক্তব্য শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্য কাঠামো ও বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যক্ত করার অনুশীলনও করতে হবে। এ লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির (أساليب البيان) সাথে পরিচিত হতে হবে এবং কোন্ বিষয় বা বক্তব্যের জন্য কোন্ বর্ণনাভঙ্গি উপযোগী সেটাও ভালো জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গিতে পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনতে হবে। তা না হলে তারা একই ধরনের বাক্য গঠনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং একই ধরনের বর্ণনাভঙ্গির মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র কেবল সাহিত্যধর্মী রচনা পড়ে এবং তা অনুকরণ করতে শিখে। তাদের সব বিষয়ের রচনায়ই এই সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকি নিরেট গবেষণাধর্মী ও সাধারণ বিষয়ের লেখাতেও তারা ঐ একই সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করে থাকে, যা অত্যন্ত দোষণীয়। কারণ আরবী প্রবাদবাক্যে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে, "لكل مقام مقال" অর্থাৎ অবস্থা ভেদে বক্তব্য হতে হবে। যেমন বিষয় হবে বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি হতে হবে। অন্যথায় তা দোষণীয় বলে বিবেচিত হবে।

সমসাময়িক বিষয় ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আরবী ভাষা শিখতে হলে অবশ্যই আরবী পত্র-পত্রিকা পড়তে হবে এবং সেখান থেকে শব্দ শিখতে হবে। কারণ পত্রিকা হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও পরিভাষা উপস্থাপন করে থাকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে। যে কোনো জীবন্ত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা ভাষাবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন এবং ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী যে কোনো ভাষা শিক্ষার জন্য ঐ ভাষার পত্র-পত্রিকা পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আধুনিক ও ব্যবহারিক আরবী ভাষা শিখতেও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। একটা কথা আমাদের ভালো করেই মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব আরবী গ্রন্থ সমসাময়িক যুগের লেখকগণ রচনা করেছেন সেগুলো পড়ে বুঝার

জন্যও আমাদেরকে এই আধুনিক ও ব্যবহারিক আরবী ভাষা শিখতে হবে। কাজেই আমাদের দেশে আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্সে আরবী সংবাদপত্র পঠন ও অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থাও করতে হবে।

পরিশেষে যে বিষয়টির প্রতি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের ভাষা চর্চাটা হতে হবে সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং প্রয়োজন পূরণে হতে হবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও অনুশীলন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত মানের আরবী ভাষা শিক্ষাও সম্ভব হবে না এবং আরবী সাহিত্য চর্চাও সম্ভব হবে না।

শেষ কথা

আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, সেগুলো মনে রেখেছে, বুঝেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কারণ কেউ নিজে ফকীহ্ (জ্ঞানী) না হয়েও ফিকহ্ (জ্ঞান) বহনকারী হতে পারে। আবার কেউ তার নিজের চাইতে বড় ফকীহ (জ্ঞানী) এর নিকটও ফিকহ্ পৌঁছে দিতে পারে।" [আবু দাউদ, তিরমিযী এবং আহমদ থেকে বর্ণিত]

আমরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এবং আমাদেরকেই পৃথিবীকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ দিয়ে শাসন করতে হবে। জনগণ আমাদের কাছেই আসবে ইসলাম শিখতে। আমরাই তারা যাদেরকে পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হবে আমিল, ওয়ালী কিংবা মুজাহিদ হিসেবে। ঠিক সেভাবেই যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের প্রেরণ করতেন। আমরা জানি, মু'আজ বিন জাবাল যখন ইয়েমেনে প্রেরিত হয়েছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নত ও তার ইজতিহাদের দ্বারা রায় দেবেন। সুতরাং, আমরা যদি সেই আলী, মু'আজ, আমর ইবনুল আস (রা)-দের সত্যিকার উত্তরসূরী হয়ে থাকি এবং আমরা যদি কিছুদিনের মধ্যে তাদের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত হই তখন কিভাবে আমরা উত্তমরুপে খিলাফতের অফিসকে চালাবো যখন আমরা আরবী ভাষার জ্ঞান রাখি না।

সুতরাং আমাদের আরবী ভাষা শিখতে হবে। শুধুমাত্র সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক যোগাযোগের আরবী ভাষা নয় যা আমাদের দেশের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা একাডেমি শিক্ষা দেয়, বরং আমাদের আরবী শিখতে হবে দ্বীনকে বোঝার জন্য। ভাষা শিক্ষাকে আমাদের কঠিন কোনো কিছু মনে করা উচিত নয়। আর কেন আমরা আরবী ভাষা শেখাটা কঠিন মনে করব যখন আমরা জানি যে যাইদ (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হিব্রু ভাষা শিখতে বলেছিলেন তখন তিনি তা মাত্র ১৫ দিনে সম্পন্ন করেছিলেন। তার সময়ে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা একাডেমি ছিল না অথচ আমাদের সময়ে তা আছে। তার সময়ে কোনো টেকনোলজিও ছিল না তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অথচ আমাদের সময়ে তা আছে। আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন কাজের জন্য ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ শিখতে পারলে আরবী কেন পারবো না। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি যাতে তিনি আমাদের তাঁর কিতাবের ভাষার সঠিক জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"আর যারা আমার পথে চেষ্টা সংগ্রাম করে তাদের আমি অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দেব। আর আল্লাহ অবশ্যই রয়েছেন তাদের সাথে যারা সবচেয়ে উত্তমরুপে কাজ সম্পাদন করে।" [আনকাবুত: ৬৯]

রেফারেন্স

-Language Gurukul

-Nurul Quran Academy

-Roar Media

-Institue of Islamic Research and Teaching

-Hadith bd

-Dhaka post

- কালের কণ্ঠ

-আলোকিত বাংলাদেশ

-মুসলিম মিডিয়া

-দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ

-মাসিক আত তাহরীক

-আলোক কণিকা

-মালামিহু ফিত তাজউইদ (আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর)

-মাসিক আল কাউসার